অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

ফ্যানট্যাস্টিক

বিজ্ঞান • রোমাঞ্চ • অ্যাডভেঞ্চার

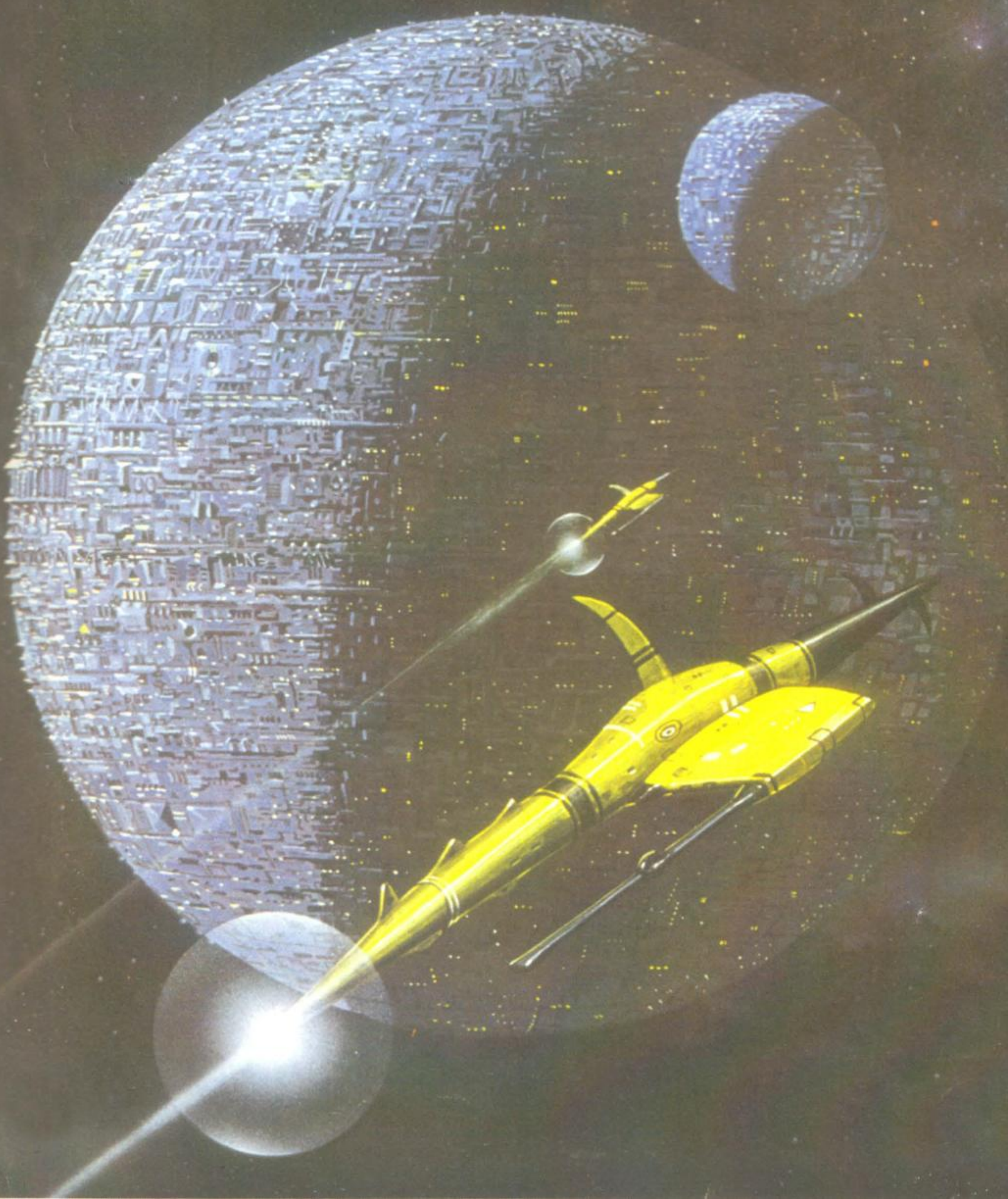

পত্রিকাটি ধুলোখেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি দিয়েছেণ - প্রিয়ব্রত রায়

স্ক্যান ও এডিট করেছেন - অপ্তিমাস প্রাইম

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে এরকমই কোন পত্রিকার কোন পুরনো সংখ্যা থাকলে এবং
আপনি যদি স্ক্যান করতে দিতে আগ্রহী থাকেন তাহলে নিচের ইমেলে যোগাযোগ করুন

optifmcybertron@gmail.com

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত

ফ্যানট্যাসটিক

পরিবর্তনের সাহিত্য ■ কল্পবিজ্ঞান ■ জানুয়ারি ২০০৪

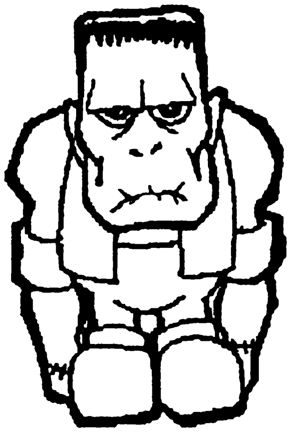

কলকাতা

ফ্যানট্যাসটিক জানুয়ারি, ২০০৪

নামাঙ্কন ■ সত্যজিৎ রায়

প্রধান পৃষ্ঠপোষক ■ জাদুকর পি সি সরকার (জুনিয়র)

সম্পাদক ■ অদ্রীশ বর্ধন

নির্বাহী সম্পাদক ■ অম্বর বর্ধন

প্রকাশনা ■ ফ্যানট্যাসটিক, ৪, রামনারায়ণ মতিলাল লেন, কলকাতা-১৪, ফোন : ২২২৭-১০১৪

প্ল্যানিং, প্রচ্ছদ, অলঙ্করণ ■ অম্বর বর্ধন

কর্মাধ্যক্ষ ■ কেয়া বর্ধন

কম্পিউটার গ্রাফিক্স ■ মানস কাঁড়ার

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি ■ নীলাদ্রি আঢ্য

সহায়তা ■ তাপস বেরা

মুখ্যসচিব ■ সুরজিৎ দে

দাম ■ ২৫ টাকা

FANTASTIC January 2004

Price Rs. 25.00

Recommended as an useful journal for different libraries of the State by Education Directorate of Govt. of West Bengal in Circular No. 308(16)SO/E Dated 8.3.77

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ৫

সম্পূর্ণ উপন্যাস

মহাপাতালের সিম্বিলিকোলাপ্টা ■ নারায়ণ চক্রবর্তী ■ ৭-২৯

গল্প

ভালোবাসার দুঃখ ■ নবকুমার ঘোষ ■ ৩০-৩৪

আপেক্ষিক তত্ত্ব ও খুন ■ সুব্রত চক্রবর্তী ■ ৪০-৪২

দুঃস্বপ্ন দ্বীপ ■ শ্রীধর সেনাপতি ■ ৪৪-৫২

কবিতা

অন্ধকারের রোদ ■ কেয়া বর্ধন ■ ৩৪

ফিল্ম কাহিনী

যে জগতে সূর্য নেই ■ অসীম বর্ধন ■ ৩৫

বিজ্ঞানের বিস্ময়

ভয়ঙ্কর দিন ■ দেবকী বর্ধন ■ ৩৬

কী এই প্লুটো? ■ সুরজিৎ দে ■ ৩৬-৩৭

ক্যুইজ

ইনি কে ■ জয় ■ ৩৮

বিচিত্র খবর ■ ৩৪, ৪২, ৫২

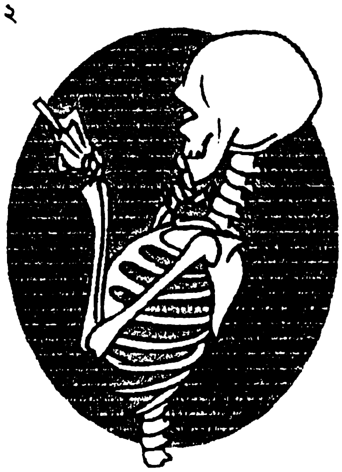

পরের সংখ্যা বেরবে এপ্রিল মাসে

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলকাতা ৭০০ ০২০

বাংলা নাট্য সংকলন ১ম খণ্ড

সম্পাদনা : ড. অজিতকুমার ঘোষ, ড. বিষ্ণু বসু, নৃপেন্দ্র সাহা ২০০্

সফদর হাসমি নাট্য সংগ্রহ (শোভন সংস্করণ)

সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা ৭৫্

শরৎ-সরোজিনী ও সুরেন্দ্র বিনোদিনী উপেন্দ্রনাথ দাস

সম্পাদনা : ড. মহাদেবপ্রসাদ সাহা ৪০্

নীল দর্পণ (ইং) সম্পাদনা : সুধী প্রধান ৭০্

গেরাসিম লিয়েবেদেফ ড. হায়াৎ মামুদ ১৮্

নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী গণেশ মুখোপাধ্যায় ৯্

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার শংকর ভট্টাচার্য ৪০্

শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ড. অজিতকুমার ঘোষ ১৫্

বাংলার নটনটী (৪র্থ খণ্ড) দেবনারায়ণ গুপ্ত ৩৫্

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৩ ২০্

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৫ ৫০্

নাট্য আকাদেমি পত্রিকা-৬ ৬০্

নাট্য আকাদেমি বক্তৃতামালা ৩, ৪ (প্রতিটি) ১০্

বঙ্গীয় নাট্যশালা ধনঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

সম্পাদনা ড. বিষ্ণু বসু ৫০্

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান

(১৯০১-১৯০৯) শংকর ভট্টাচার্য ৬০্

বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান

(১৯১০-১৯১৯) শংকর ভট্টাচার্য

সম্পাদনা অভিজিৎ ভট্টাচার্য ৮০্

বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস

কিরণচন্দ্র দত্ত সম্পাদনা প্রভাতকুমার দাস ৮০্

আশার ছলনে ভুলি (২য় সং) উৎপল দত্ত ৪৫্

প্রসঙ্গ : নাট্যকার মন্মথ রায় ৫০্

সম্পাদনা শিব শর্মা

নট-নাট্যকার-নির্দেশক গিরিশচন্দ্র ঘোষ একটি আলেখ্য

লেখা : বিষ্ণু বসু সম্পাদনা : প্রভাতকুমার দাস ৮০্

নট-নাট্যকার-নির্দেশক বিজন ভট্টাচার্য : একটি আলেখ্য

লেখা সজল রায়চৌধুরী সম্পাদনা নৃপেন্দ্র সাহা ৮০্

বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান

ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর ৩৫্

প্রাপ্তিস্থান : বইঘর কফি হাউস (কলেজ স্ট্রিট), রবীন্দ্রসদন, দীনবন্ধু মঞ্চ (শিলিগুড়ি)

বাংলা আকাদেমি ভাণ্ডার ১১৮ হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-১০

স্মারক নং ৫৩১৫/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

সম্পাদকীয়

ঝড় উঠেছিল ১৯৬৩ সালে—যখন বেরোয় 'আশ্চর্য!'—ভারতের প্রথম কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা—অভিনন্দন আর উচ্ছ্বাসের টাইডাল ওয়েভ বয়ে গেছিল বাংলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে। সে এক নতুন জ্যোতিষ্ক।

চমক ঝলক বৈচিত্র্যের দিগন্ত উন্মোচন করে দিতেই সুপ্ত প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটেছিল বহু নবীন এবং সম্পূর্ণ অজানা এবং অপ্রত্যাশিত লেখকের জাদু কলমে। যেমন, গুরনেক সিং। বাংলা তাঁর মাতৃভাষা নয়। কিন্তু তাঁর বাংলা কল্পবিজ্ঞান যুগপৎ ঈর্ষা আর সম্ভ্রম, বিস্ময় আর প্রেরণা জুগিয়েছে বহুজনকে। তিনি চলে গেলেন সাগর পাড়ে।

'আশ্চর্য!'র পরে 'অত্যাশ্চর্য!' বের করার উপদেশ দিয়েছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। চন্দ্রনাথ দে প্রচ্ছদ এঁকেও ফেলেছিলেন। কিন্তু অনুমতি পাওয়া গেল 'ফ্যানট্যাসটিক' নাম-এর।

সেটা ছিল ১৯৭৫ সাল। বিপুল উৎসাহে বালক, তরুণ, বৃদ্ধ 'ফ্যানট্যাসটিক' আসরে জড়ো হয়েছিলেন। পরে, বইমেলায় তখন বই-ভালোবাসার বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে, 'ফ্যানট্যাসটিক' স্টলে ছিল না গেট, ওপরে ঝোলানো ছিল লাল সালু-তে আঁকা সত্যজিৎ রায়ের নামাংকন, ভেতরে ডেকরেটরের কাছ থেকে ভাড়া করে আনা খাবার টেবিল, বিছানার চাদর দিয়ে ঢাকা—বছর বছর সেই সহজ, সরল বই-পাগলদের স্টলের ছবি ছাপা হয়েছিল বইমেলার ইয়ামোটা স্যুভেনিরে। অনেক রাতে নিরিবিলিতে প্রায় জনশূন্য মেলা প্রাঙ্গণে এসে দীর্ঘকায় সত্যজিৎ রায় এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন লাল সালু-তে আঁকা 'ফ্যানট্যাসটিক' নামাংকনের দিকে।

সেই বই-ভালবাসা আজও যায়নি। তাই আজ মেলা-ময় ময়দানে মেলা-রানি হয়ে রয়েছে বইমেলা। থাকবেও।

আর থাকবে 'ফ্যানট্যাসটিক'। প্রতি মাসে আপাতত আত্মপ্রকাশ করতে পারছে না—তিন মাস অন্তর ভাল ভাল লেখায় মন মাতানো হয়ে নামবে আসরে। তারপর? দেখা যাক। ■

পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি

১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড) কলকাতা ৭০০ ০২০

কাজী নজরুল ইসলাম রচনাসমগ্র ৩

চতুর্থ খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে ২০০৲

৫ খণ্ডে গ্রাহকমূল্য ৬০০৲

অবিলম্বে গ্রাহক হোন

বাঙালির গান ৭০০

দুর্গাদাস লাহিড়ি সম্পাদিত

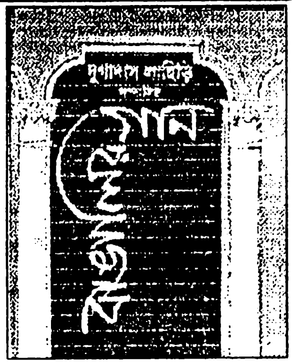

প্রত্যেক গীতিকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয়সহ
৫৬৬২টি গানের সংকলন গ্রন্থ

বর্তমান সংস্করণের সম্পাদনা অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রদ্ধালেখমালা সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন ১৫০৲ পবিত্র সরকার সম্পাদিত ○ সুকুমার সেন ৩০৲ অলোক রায় ○ বাংলায় ভারতছাড়ো আন্দোলন ১৩০৲ অমলেন্দু দে ○ পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ২০০৲ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ○ সম্পর্ক : সম্প্রীতি বিষয়ক গল্প সংকলন ১৫০৲ বিষ্ণু বসু অশোককুমার মিত্র সম্পাদিত ○ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ৩০৲ অরুণ মুখোপাধ্যায় ○ হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও হিন্দু পেট্রিয়ট ৯০৲ গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ○ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ৫০৲ বুদ্ধদেব দাস ○ জীবনানন্দ দাশ ১৩০৲ প্রভাতকুমার দাশ ○ মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ৫০৲ যুগান্তর চক্রবর্তী সম্পাদিত ○ বেদে সংশয় ও নাস্তিক্য ৪০৲ সুকুমারী ভট্টাচার্য

লোকসংস্কৃতির নন্দনতত্ত্ব ৪০৲ পবিত্র সরকার

বাংলা সাহিত্যের নরনারী ৫০৲ প্রমথনাথ বিশী

রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য ৮০৲ সজনীকান্ত দাশ

শুদ্ধ বাংলা শিখতে গেলে পাশে রাখুন

আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান (২য়) ১৬০৲

আকাদেমি বানান অভিযান (৪র্থ) ১০০৲

বাংলা বানানবিধি (৫ম সং) ১২৲

পরিভাষা প্রশাসন (৩য় সং) ২৫৲

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচনাসমগ্র

১০ম খণ্ড প্রকাশিত

প্রতি খণ্ডের মূল্য ১৬০৲

যোগাযোগ : দূরভাষ ২২২৩-৯৯৭৮ ২২২৩-০৪০৭ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২২৩-০৯৪৬
ই-মেল bakademi@vsnl.com

স্মারক নং ৫৩১৫/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

ফ্যাকাশে সবুজ মুখ .... প্রকাণ্ড গোল মাথা গলাটা মুঠোর মত সরু পিপের মত বড় ...
রক্তাভ ভাঁটার মত চোখ। হঠাৎ অসম্ভব দ্রুত গতিতে ছুটে এল কিম্ভূত জীবটা!

মহাপাতালের সিম্বিলিকোলাপ্টা

নারায়ণ চক্রবর্তী

এক
(পর্বতারোহী অরবিন্দ মজুমদার)

বাইরের উজ্জ্বল চোখ ধাঁধানো রোদ থেকে ঘরের ভেতরের স্নিগ্ধ অনুজ্জ্বল ছায়া ছায়া আঁধারে এসে প্রথমটাতে ঘরের ভেতরের কোনো কিছুই ঠাহর করে উঠতে পারলাম না,—কয়েক সেকেণ্ড কেটে গেল, তারপর আমার চোখ দুটো এই নতুন পরিবেশের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিল, দেখতে পেলাম যে একটা বিরাট ড্রইংরুমের দরজার কোণে দাঁড়িয়ে আছি আমি। ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা মস্ত গোল মূল্যবান কার্পেট পাতা, তার ওপর সুন্দর কাশ্মীরি কাজ করা রোজ-উডের একটা নিচু গোল টেবিলকে ঘিরে চক্রাকারে সাজানো আছে খানকয়েক সোফা-সেট। ডিস্টেম্পার করা দেওয়ালে মনোমুগ্ধকর দেবতাত্মা হিমালয়ের তুষার মৌলী শুভ্র শিখরের সুন্দর সুন্দর ছবি।

খালি ঘরে একা দাঁড়িয়ে মুগ্ধ চোখে ছবিগুলো দেখতে লাগলাম।

সময়ের চাকা থেকে ঝরে পড়ল কয়েকটি নিঃশব্দ মুহূর্ত।

বিপরীত দিকের ভেতরে যাবার দরজায় ঝোলানো ভারি পর্দাটা দুলে উঠল, পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন সৌম্য-দর্শন প্রসন্ন-মুখ অরবিন্দ মজুমদার। যুক্ত করে আমাকে নমস্কার করে অরবিন্দবাবু বললেন,—"একি, দাঁড়িয়ে কেন? বসুন?"

কাছাকাছি সোফায় আরাম করে বসে আড় চোখে অরবিন্দবাবুকে দেখলাম। ছবি দেখে যা ভেবেছিলাম তা নয়, বছর পঁয়ত্রিশের বেশি হবে না তাঁর বয়স, শক্ত সমর্থ শরীর। মুখে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও প্রজ্ঞার ছাপ। পাজামা পাঞ্জাবিতে চমৎকার মানিয়েছে তাঁকে।

অমায়িক হেসে অরবিন্দবাবু বললেন,—"আপনিই কি—"

সবিনয়ে বললাম,—"আজ্ঞে হ্যাঁ, দৈনিক 'অভ্রভেদী' থেকেই আসছি আমি, আমার নাম মকরন্দ মুখার্জি, দৈনিক 'অভ্রভেদী'র সহ-সম্পাদক আমি—"

স্মিত হাসিতে ভরে গেল অরবিন্দবাবুর মুখ, অল্প কুণ্ঠার সঙ্গে তিনি বললেন,—"আপনি নিজে কেন এত কষ্ট করলেন মকরন্দবাবু, যে কোনো একজন স্টাফ রিপোর্টার পাঠালেই তো চলত—"

আমি বললাম,—"তা হয় তো চলত,কিন্তু তা হলে আপনার সঙ্গে একত্রে এই সুন্দর সকালটা কাটাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতাম আমি। হিমালয়ের দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে আপনার যে অনন্য সাধারণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা রয়েছে, তা আপনার মুখ থেকে শুনে দেশের জনগণকে জানাবার প্রথম সৌভাগ্য আমরাই পেতে চাই, তাই অভ্রভেদীর কর্তৃপক্ষ আপনার ফিরে আসবার খবরটা পাওয়া মাত্রই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন সবার আগে—আপনার বিবৃতি সংগ্রহ করবার জন্য—"

"আপনার কথাগুলো ভারি সুন্দর মকরন্দবাবু, বিশেষ করে অনেকদিন পরে মাতৃভাষা শুনতে পেয়ে খুবই ভালো লাগছে আমার, কিন্তু ভাবছি যে সব কথা শোনা হয়ে গেলে পর, আপনার এই মূল্যবান সময় নষ্ট করবার জন্য অনুতাপ করবেন কি না—"

"অনুতাপ! কী বলছেন আপনি?"

"হ্যাঁ,কারণ আমার এক দিনের অভিজ্ঞতা আমার সঙ্গে যত নির্মম সত্যই হোক না কেন, সাধারণ লোকের কাছে তা অলীক কল্পনা বলে মনে হওয়াটাই হবে স্বাভাবিক—"

প্রতিবাদের সুরে আমি কী যেন বলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই সেই ভারী পর্দাটা আর একবার দুলে উঠলো, চায়ের সরঞ্জামে ভরা রূপার ট্রে হাতে ঘরে ঢুকলো একটি নেপালী কিশোরী, নিঃশব্দে এগিয়ে এসে একটি নিচু টিপয়ের ওপর ট্রে-টি বসিয়ে দিল সে।

মৃদু স্বরে নেপালী ভাষায় তাকে কী যেন বললেন অরবিন্দবাবু, মেয়েটি অবাক চোখে আমার মুখে একবার তাকিয়ে ঘাড় নেড়ে ভেতরে চলে গেল।

টি-পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে মৃদু স্বরে অরবিন্দবাবু বললেন,—"এই মেয়েটি, সিঙ্কিনা খোম্পানীনা, না থাকলে হয়তো আমিও সমস্ত ব্যাপারটাকে একটা দুঃস্বপ্ন বলেই মনে করতাম, মকরন্দবাবু, কিন্তু ..."

অরবিন্দবাবুর মন যেন কয়েক মুহূর্তের জন্য স্মৃতির সমুদ্রে ডুবুরীর মতো ডুব দিল, চোখে পড়ল এক অজানা জগতের আলো।

দামি চায়ের মৃদু সুগন্ধ আস্তে আস্তে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আমি চা-স্পৃহ-চঞ্চল মানুষ, তাই তৈরি চায়ের সামনে বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা খুবই কঠিন আমার পক্ষে, তাই হয়তো একটু উসখুস করে থাকব, আর তার ফলেই যেন অরবিন্দবাবু বাস্তব জগতে ফিরে এলেন, এক পেয়ালা চা আমার হাতে তুলে দিয়ে নিজে এক পেয়ালা নিলেন।

চা খেতে খেতে আমি বললাম,—"ত্রিশূল অভিযাত্রী দলের সহ-অধিনায়ক শ্রীবাজপেয়ী যখন ফিরে এসে আপনার নিরুদ্দেশ হবার সংবাদটি সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করলেন, তখন কিন্তু সারা দেশে হুলস্থূল পড়ে গিয়েছিল—"

মৃদু হেসে অরবিন্দবাবু বললেন,—"হ্যাঁ, নেতাকে হারিয়ে ওরা বেশ একটু বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল বই কি,—"

"এর আগে দুর্জয় হিমালয়ের তিন তিনটি দুর্গম দুরারোহ শৃঙ্গ জয় করেছেন আপনি, পৃথিবীর পর্বতারোহীদের মধ্যে আপনার স্থান প্রথম সারিতে, তবু কি করে যে আপনার মতো অভিজ্ঞ,কুশলী পর্বতারোহী অমনভাবে হারিয়ে গেল, তা নিয়ে গোটা পৃথিবীতে জল্পনা-কল্পনার আর সীমা ছিল না—"

"হ্যাঁ, ফিরে এসে এ দু'দিনে তার কিছু কিছু খবরের কাগজে দেখেছি বটে, তবে বেশির ভাগ সাংবাদিকদের কষ্ট-কল্পনার বহর দেখে মনে মনে হেসেছি প্রচুর—"

সাংবাদিকতার ওপর এই প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গোক্তির জন্য আমি মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম, বললাম, "দেখুন,সঠিক তথ্য জানা না থাকলে কল্পনার পক্ষীরাজ একটু উঁচুতেই উড়ে থাকে, তার জন্য কাউকে দোষ দেওয়া যায় কি?"

আমার কথা শুনে অরবিন্দবাবু হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন, —"আপনি রাগ করবেন না মকরন্দবাবু,—কিন্তু আসল ব্যাপার কি জানেন? কল্পনার পক্ষীরাজ যত উঁচুতেই উড়ুক, সত্যের প্রখর তাপে সে ভস্ম হয়ে যাবেই যাবে। আমি যে বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে এসেছি তার কাছাকাছি পৌঁছুতে পারে এমন দুঃসাহসিক কল্পনা সায়েন্স ফিকশ্যান লিখিয়ের মাথাতেও আসতে ভয় পাবে, তাই ভাবছিলাম আপনাদের কাগজে এর বিবরণী বেরুলে লোকে একে বিশ্বাস করতে পারবে কি?"

আমি অভয় দিয়ে বললাম,—"আপনি সেজন্য ভাববেন না অরবিন্দবাবু, আপনি দেশের সবার শ্রদ্ধার পাত্র, আপনার কথা কেউ অবিশ্বাস করবে না—"

আমাদের চা খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। সিঙ্কিনা খোম্পানীনা আবার এসে ট্রে-সহ খালি পেয়ালাগুলো নিয়ে চলে গেল, আমি আমার সিগারেট কেস খুলে এগিয়ে ধরলাম অরবিন্দবাবুর দিকে।

একটু পরে স্বচ্ছ নীলচে ধোঁয়ায় প্রীতিপ্রদ গন্ধে অরবিন্দবাবুর ড্রইংরুম ভরে গেল।

সোফায় হেলান দিয়ে আয়েসে দু'চোখ বুঁজে অরবিন্দ মজুমদার,তাঁর চমকপ্রদ নিরুদ্দেশ কাহিনী বলতে আরম্ভ করলেন।

আমি নোট বই খুলে বাংলা শর্টহ্যাণ্ডে তাঁর প্রত্যেকটি কথা লিখে নিতে লাগলাম।

মার্চ মাসের একুশ তারিখে হিমালয়ের ত্রিশূল শৃঙ্গ জয় করবার জন্য আমাদের অভিযাত্রী পর্বতারোহীর দল কলকাতা থেকে রওনা হয়ে গেল। আমাদের এই দলটির একটা বিশেষত্ব ছিল, দার্জিলিং মাউন্টেনীয়ারিং স্কুল থেকে সদ্য পাশ করা দুটি তরুণী বিনতা দত্ত ও শোভা মুস্তফর আমাদের দলে যোগ দিয়েছিলেন।"

আমি বললাম, "অভিযানের সহ-অধিনায়ক বিনায়ক বাজপেয়ীর সঙ্গে শোভা মুস্তফরের বিয়ে হয়ে গেল এই সেদিন,—পেট পুরে নেমন্তন্ন খেলাম আমরা। খাবারের রকমারি আইটেমের মধ্যে এক পিস করে বরফও ছিল—"

অল্প হেসে অরবিন্দবাবু বললেন,—"বাঃ বেশ নতুন আইডিয়া তো। ব্যাপার কি জানেন, ওদের মধ্যে ভালোবাসা ছিল অনেক দিন আগে থেকেই, কিন্তু শোভার পণ নিজে পর্বতারোহিণী না হয়ে বাজপেয়ীর ঘরণী হবে না কিছুতেই, সে যাক—এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহেই আমরা আঠারো হাজার ফিট ওপরে আমাদের বেস ক্যাম্প স্থাপন করলাম। আমি আর শেরপা শিনজিন দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে চূড়ার দিকে এগিয়ে যেতে লাগলাম।

সে দিন বাতাস ছিল না, তবু বহু শীতের কামড়ে সীজন করা আমার শরীর যেন দিনের সেই দুর্জয় শীতকে সহ্য করতে পারছিল না। চারদিকে কঠিন তুষারের জমাট স্তূপে সূর্যের আলো পড়ে যে চোখ ধাঁধানো দীপ্তি বিচ্ছুরিত করছিল, তার ঝলক যেন আমার বিশেষ ধরনের চশমায় সুরক্ষিত চোখে এসে লেগেছিল।

"একুশ হাজার ফুট উঁচুতে উঠে একটা বিশাল হিমবাহের সামনা-সামনি পড়ে আমি আর শেরপা শিনজিন থেমে গেলাম। বাঁদিকে গভীর, অতলস্পর্শী গিরিখাত, ডানদিকে বিপুল হিমবাহের বিশাল বিস্তার,সুমুখে খাড়া পাহাড়। লক্ষ্য করলাম যে, হিমবাহের ওপারে পাহাড়ের গা অনেকটা ঢালুভাবে ওপরে উঠে গেছে।

"পিঠে বসানো অকসিজেন গ্যাস মাস্কটা ডান হাতে চেপে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম। এতক্ষণ ধরে একটানা দুরারোহ পাহাড়ের খাড়া গা বেয়ে প্রতি ইঞ্চি উচ্চতার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে এতখানি ওপরে উঠে এসেএই সামান্য বিশ্রাম সুখটুকু যেন অমৃত বলে মনে হচ্ছিল।

"কী করব, কোন পথে এগিয়ে যাব, এক মনে তাই ভাবছিলাম। শেরপা শিনজিন একটু দূরে দাঁড়িয়েছিল, হয়তো সে-ও বিশ্রামের মদিরা পান করে চাঙ্গা হয়ে উঠেছিল। পেছনে ফিরে একটা পরামর্শ করবার জন্য তাকে ডাকব ডাকব করছি, এমন সময়ে হঠাৎ পেছন থেকে চীৎকার করে উঠল, 'ইয়েতি—"

"ইয়েতি!"---কথাটা কানে যেতেই আমার সমস্ত শরীর যেন হিম হয়ে এল। ইয়েতিদের কথা এর আগে অনেক শুনেছি বটে, কিন্তু চোখে কখনো দেখিনি। তাই তারা শান্ত কি হিংস্র, বুদ্ধিমান কি বর্বর কিছুই জানি না। আর এ জগতে যা কিছু অজ্ঞাত, যা যত অন্ধকার তাকেই তো তত ভয়, সত্য জ্ঞানের আলোক দীপ্তিতে স্নাত হওয়া পর্যন্ত তার প্রতি একটা বিভীষিকা জেগেই থাকে মানুষের মনে।

"এতগুলো কথা বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মনের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত খেলে গেল, আর, কিছু ভাববার আগেই কে যেন আমাকে পেছন থেকে প্রচণ্ড বেগে ধাক্কা দিল, সঙ্গে সঙ্গে আমি একটা হালকা পাখির মতো শূন্যে উড়ে গেলাম,---অতি প্রশস্ত ছুরির ফলার মতো নিষ্ঠুর তীক্ষ্ণ হিমবাহের ওপরে পড়লাম। সঙ্গে চারদিক যেন অন্ধকার হয়ে এলো, জ্ঞান হারাবার পূর্ব মুহূর্তে শেরপা শিনজিনের আরও একটা আতঙ্কদীর্ণ চীৎকার শুনতে পেলাম। তার পরে আর কিছু মনে নেই---"

একটু দম নেবার পর থামলেন অরবিন্দবাবু। স্তব্ধ ঘরে বহু দূরের রাস্তার ট্রাম ও বাসের ক্ষীণ শব্দ ভেসে এলো, ঘরের স্তব্ধ বায়ুস্তরে ভেসে-ভেসে বেড়াল।

আমি শিউরে উঠে বলে উঠলাম,---"কী---ভয়ানক---"

হাসির ছোঁয়ায় চঞ্চল হয়ে উঠলো অরবিন্দবাবুর চোখ দুটি, মৃদু কণ্ঠে বললেন,---"ভীষণ আর ভয়ানককে নিয়েই তো আমাদের,---মানে পর্বতারোহীদের কারবার, আর সেই জন্যেই তো অভিযানগুলো এত মাদকতাপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর হয়ে ওঠে, মকরন্দবাবু। তুষার-ঝঞ্ঝা, তুষার-ক্ষত, তুষার-ধবল,---এই অস্ত্রগুলোর সুনিপুণ প্রয়োগ করেই তো প্রকৃতিদেবী তাঁর চির রহস্য-গুণ্ঠন উন্মোচন করবার কাজটা দুঃসাধ্য করে তোলেন। কিন্তু মানুষ তবু ক্ষান্ত হয় না, বার বার এগিয়ে যায় সব বাধা বিপত্তি তুচ্ছ করে। সেই জন্যেই তো প্রকৃতির অফুরন্ত রহস্য ভাণ্ডারের একটি বিচিত্র ঝলক দেখে এলাম আমার এই আপাত নিষ্ফল অভিযানে।"

দুই
(আলোক খাদ্য)

"কতক্ষণ যে জ্ঞান হারা অবস্থায় ছিলাম তা বলতে পারি না, জ্ঞান ফিরলে পর মনের আচ্ছন্ন ভাবটা আস্তে আস্তে কেটে যেতে মাথাটা ভীষণ ভার ভার বলে মনে হল, বুকের ওপর একটা চাপও অনুভব করলাম।

"শুয়ে ছিলাম,চোখ মেলে আস্তে আস্তে উঠে বসলাম, লক্ষ্য করলাম যে আমি কঠিন পাথরের মেঝের ওপর বসে আছি, চারদিক প্রথম সন্ধ্যার তরল অন্ধকারে ঢাকা, সামনে পেছনে, ডাইনে বাঁয়ে কোনো দেওয়াল দেখতে পেলাম না, দেখতে পেলাম না মাথার ওপর তারকার হীরকখণ্ড খচিত কোনো আকাশ। একটা ভয়ঙ্কর স্তব্ধ নির্জনতা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। এই ভীষণ শব্দহীনতা একটা ভোঁতা অস্ত্রের মতো আমার মগজের ভেতর আঘাত করতে লাগলো। আমি স্থির হয়ে উঠলাম।

আমার আশেপাশে সমস্ত জায়গা জুড়ে যে আবছা অন্ধকারের ঢেউ বয়ে যাচ্ছিল সেই অতি সামান্য আলোর উৎসটা ঠিক কোথায় তা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

ভীষণ ঠাণ্ডায় আমার হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে পড়েছিল, মাথার ওপর একটা ভোঁতা যন্ত্রণা, চোখ দুটো কড়কড় করছিল আর কানে জল ঢুকলে যেরকম ভোঁ-ভোঁ, অস্বস্তি হয়, সেই ধরনের একটা অস্বস্তি অনুভব করছিলাম, বুকের ওপর যেন একটা পাষাণ ভার।

কঠিন পাথুরে মেঝের ওপর অতি কষ্টে উঠে দাঁড়ালাম আর দাঁড়িয়েই অদূরে যে দৃশ্যটা দেখলাম, তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না বলেই বোধহয় আমার গলা দিয়ে একটা অর্থহীন আর্তনাদ বেরিয়ে গেল। সমস্ত শরীরে রোমাঞ্চিত হল, মাথার চুলগুলো সব খাড়া হয়ে গেল।

হাত আট-দশ দূরে একটা কিম্ভূত দর্শন জীব অন্ধকারের গর্ভ থেকে বেরিয়ে এসে তার রক্তাভ ভাঁটার মতো চোখ দুটো দিয়ে অপলকভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার মস্ত মাথার দু'পাশ থেকে সরু বেতের মতো লিকলিকে দুটো অ্যানটেনা কাঁপতে কাঁপতে এদিকে ওদিক ঘুরছে।

ভয়ে শিউরে উঠে আমি দু'পা পিছিয়ে গেলাম।

ফ্যাকাশে সবুজ মুখ প্রাণীটা অন্তত পাঁচ ফুট উঁচু, সামনে পেছনে আট ফুটের কম হবে না, প্রকাণ্ড মাথাটা সম্পূর্ণ গোল, গলাটা আমার হাতের মুঠোর মতো সরু, তার পরেই একান্ত পিপের মতো তার ধড় পেছন দিকে ছুঁচলো হয়ে গেছে, উটের পায়ের পাতার মতো সরু সরু চারটি পা তার ওই ভারী পিপে-ধড়টাকে মাটি থেকে প্রায় দু'ফুট ওপর তুলে রেখেছে। হাত দুটো বেশ লম্বা আর সরু, তিন-চারটে অস্থিসন্ধি থাকায় যেভাবে যেদিকে খুশি সঞ্চালিত করতে পারে। কিন্তু এত সব পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ আমার নজরে পড়েছিল অনেক পরে, কারণ ঠিক সেই মুহূর্তে আমার সারা চোখ জুড়ে ছিল তার সম্পূর্ণ গোল প্রকাণ্ড মাথা, গোল বাতাপী লেবুর মতো রক্তাভ দুটি চোখ, তার নিচে দুটো গোল ফুটো আর বুনো শুয়োরের মুখের মতো সামনের দিকে এগিয়ে আসা ছন্দ-শ্রী-হীন মুখে।

আমাকে দু'পা পিছিয়ে যেতে দেখে কিম্ভূত প্রাণীটা থমকে দাঁড়াল, কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে আমার চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইল, সরু বেতের মতো এ্যানটেনা দুটো পরস্পরের সঙ্গে ঘষতে লাগল।

আমার মাথা ঝিমঝিম করে উঠলো। কোথায় এসে পড়েছি কিছুই জানি না, অবছা অন্ধকারে চারিদিক ভালো করে দেখতেও পাচ্ছি না, প্রাণীটা হিংস্র কি না জানি না, কিন্তু যদি অতর্কিতে আক্রমণ করে তবে নিজেকে কিভাবে রক্ষা করব, তা হঠাৎ ভেবে পেলাম না, কারণ আমার সঙ্গে বন্দুক বা রিভলভার ছিল না।

হঠাৎ ওর ওই সরু সরু চার পায়ে ভর করে ভারী শরীরটাকে দ্রুত গতিতে আমার কাছে ছুটিয়ে নিয়ে এলো প্রাণীটা, আমি দিশ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে একদিকে ছুটতে চেষ্টা করলাম কিন্তু পারলাম না, পা দুটো যেন অসম্ভব ভারী বলে মনে হল।

প্রাণীটা আমার খুব কাছে এসে দাঁড়াল, তখন আমি ওর বীভৎস চেহারাটা আরও ভালো করে দেখতে পেলাম। লক্ষ্য করলাম যে, তার সারা গা হাল্কা সবুজ রং-এর অতি সূক্ষ্ম রোমে ঢাকা, নাকের দু'পাশ থেকে বেরিয়ে আসা সবুজ এ্যানটেনা দুটো সুমুখের দিকে ক্রমশ সরু হয়ে গেছে, তার শেষপ্রান্তে একটা ছোটো বলের মতো মাংসপিণ্ড প্রতি মুহূর্তে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হচ্ছে। এই সব দেখে নিদারুণ ঠাণ্ডাতে ও অদম্য পিপাসায় আমার মুখ গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

প্রাণীটা তার লম্বা বহু ভাঁজ টেলিস্কোপিক হাত দুটো বাড়িয়ে অপরিসীম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আমার গ্যাস মাস্ক ও পর্বতারোহীর ভারী পোশাক খুলে ফেলল, আমার কপাল গাল আর গলা স্পর্শ করল, লক্ষ্য করলাম যে ওর হাতের তিনটি আঙুল হাল্কা সবুজ পর্দা দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত, ওর স্পর্শে আমার গা গুলিয়ে উঠলো,—কেমন যেন আঠা আঠা, চটচটে আর গরম।

বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক দুই হাতে দু'পাশ থেকে আমার গলাটা চেপে ধরে রইল সেই প্রাণীটা, আত্মরক্ষার জন্য আমি আমার হাত দুটো দিয়ে ওর হাতের কব্জি চেপে ধরলাম, সরু সূক্ষ্ম রোমগুলো কাঁটার মতো আমার হাতে বিঁধতে লাগল, কিন্তু আমি প্রাণপণ চেষ্টা করেও ওর হাত দুটো এক চুলও সরাতে পারলাম না। কাঁটা বেঁধার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়তে লাগলো, হাতের তালু যেন অ্যাসিডের দাহে জ্বলতে লাগলো। আমি হাত নামিয়ে নিলাম।

গলা টিপে দম বন্ধ করে মারবার কোনো মতলব বোধ হয় প্রাণীটির মনে ছিল না, সে শুধু আলতোভাবে চেপেই রইল। প্রথমটায় খুব অস্বস্তি বোধ করলেও একটু পরে আমি বেশ সুস্থ বোধ করতে লাগলাম। ওর হাতের তালু থেকে একটা তাপ প্রবাহ আমার শীতজর্জর দেহে নেমে আসছে বুঝতে পারলাম, আমার শরীর দেখতে দেখতে গরম হয়ে উঠলো, আমার আচ্ছন্ন ভাব কেটে গেল আর অনেকক্ষণ ধরে দেখার ফলেই বোধহয় ওই অদ্ভুত জীবটাকে আর তেমন অদ্ভুত বলে মনে হল না। প্রাণীটা অপরিসীম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে আবার আমার পোশাক পরিয়ে দিল।

এই যে এতগুলো ঘটনা ঘটে গেল, তা যেমন আকস্মিক তেমনি অদ্ভুত, কিন্তু মানুষের মস্তিষ্ক বৃদ্ধি সব আকস্মিকতার সঙ্গেই তাল রেখে চলতে পারে। তাই প্রাথমিক বিপর্যস্ত ভাবটা আমার মন থেকে যতই কেটে যেতে লাগলো, ততই আমি এই বিচিত্র দেশ ও তার অধিবাসীদের সম্বন্ধে কৌতূহলী হয়ে উঠতে লাগলাম।

এদিকে শীতের অনুভূতি দূর হওয়ার পর আমার শরীরের তাপ স্বাভাবিক হয়ে এলো, শারীরিক অন্যান্য অনুভূতিগুলো যেন শৈত্যের কবলমুক্ত হয়ে অতিমাত্রায় সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠলো। ভীষণ খিদেতে পেটের বত্রিশ পাক নাড়ি টনটনিয়ে উঠলো।

হয়তো আমার চোখ মুখ দেখে অদ্ভুতদর্শন প্রাণীটা আমার মনের কথা বুঝতে পারল, আমার গলা থেকে তার বহুভাঁজ টেলিস্কোপ হাত সরিয়ে ছোট করে ফেলল, কয়েক পা পেছনে হটে গেল, তারপর তার নাকের দু'পাশের লম্বা সরু অ্যানটেনা দুটো দ্রুত ছন্দে ঘষতে লাগল।

অ্যানটেনা ঘষার প্রক্রিয়ায় বাতাসে যে হাই ফ্রিকোয়েন্সি শব্দ তরঙ্গ উত্থিত হল তা আমি শুনতে পেলাম না, কারণ শব্দ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের যে সীমার মধ্যে আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় বাঁধা, এই শব্দ তরঙ্গের দৈর্ঘ্য নিশ্চয়ই তার চেয়ে অনেক কম বা অনেক বেশি।

এই সময়ে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। এই পরম স্তব্ধতার রাজ্যে বহুদূর থেকে একটা মিষ্টি বাজনার আওয়াজ শুনতে পেলাম, অনেকটা সরোদের আওয়াজের মতো। আমার পা থেকে হাত দুই দূরে কোথা থেকে একটা চক্রাকার নীলাভ আলো এসে পড়ল। আলোর উৎসটা আমি দেখতে পেলাম না বটে কিন্তু লক্ষ্য করলাম যে, সেই প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠে অলোর রশ্মির একটা অতি সূক্ষ্ম সূত্র দূর হতে পুঞ্জিত অন্ধকারে কোথায় যেন হারিয়ে গেছে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সেই নীলাভ আলোর তীব্রতা বহু গুণে বেড়ে গেল, আলোক বৃত্তটা সরে আসতে আসতে আমার সারা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। এই আশ্চর্য আলোক ধারায় স্নান করতে করতে আমার শরীরটা বারে বারে কেঁপে কেঁপে উঠলো, মাংসপেশীগুলো আপনা থেকেই সঙ্কুচিত ও প্রসারিত হতে লাগল, স্নায়ুতন্ত্রগুলি অতিমাত্রায় সতেজ হয়ে উঠে একটা কেমন করা অস্বস্তিতে সারা মন ভরে গেল। কিন্তু যেন শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্য, একটু পরেই সারা শরীরে একটা পরম স্নিগ্ধতার রমণীয় আবেশ ছড়িয়ে পড়ল, একটা অপূর্ব প্রশান্তিতে ছেয়ে গেল সমস্ত হৃদয়। অবাক হয়ে অনুভব করলাম যে, আমার একটু আগের নাড়িভুঁড়ি হজম করে ফেলবার মতো ক্ষিদের আর বুক ফাটানো তৃষ্ণা কোথায় যেন উড়ে গেছে। পেট পুরে খাবার পর শরীরে যে একটা আলস্য-মন্থর শিথিলতা আসে, তাই এল আমার শরীরে।

আমি বিজ্ঞানী নই, তবু বিজ্ঞানের মূল সূত্রগুলো আমার অজানা নয়। আমি এটুকু জানি যে, দেহের পুষ্টি সাধন, তাপ উৎপাদন আর এনার্জি জোগাবার জন্যই খাদ্যের প্রয়োজন, কিন্তু মনুষ্য সমাজের অনাবিষ্কৃত এই আশ্চর্য দেশে দেখছি বিশেষ ধরনের আলোকরশ্মির সাহায্যেই খাদ্যের প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়েছে। খাদ্য সমস্যা জর্জরিত পৃথিবীতে বিজ্ঞানী মহল যে কথা এখনো ভাবতেও পারেনি এরা দেখছি তাতেই সিদ্ধকাম। এ ধরনের যুগান্তকারী আবিষ্কারের পেছনে যে বিজ্ঞানীর মস্তিষ্ক কাজ করেছে, তা না জানি কতই অসাধারণ। তাঁর প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা অবনত হয়ে এল। ভাবলাম যে, পৃথিবীতে আমাদের বিজ্ঞানী মহল যতই কেন না মহাকাশে ঘুরে আসবার ব্যবস্থা করুন, বিজ্ঞান প্রতিভার এই আশ্চর্য দেশের বিজ্ঞানীদের কাছে তাঁরা এখনও শিশু ছাড়া আর কিছুই নন।

অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা অদ্ভুতদর্শন প্রাণীটি তার ভাঁটার মতো চোখ দুটো দিয়ে আমার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। ও যেন বুঝতে পারল যে আমার খিদে তেষ্টা সব মিটে গেছে। ও তখন আবার ওর অ্যানটেনা দুটো ঘষতে আরম্ভ করল, বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে দিতে লাগল কোনও একটা অজানা সঙ্কেত। সে সঙ্কেত কেন বা কার উদ্দেশ্যে তা আমি বুঝতে পারলাম না।

আমার শরীরটা তখন বেশ ঝর ঝরে লাগছিল, তাই কৌতূহলী চোখে আমি ওই প্রাণীটার ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করছিলাম। কারণ আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, এই প্রাণীরা আমাদের যতই অপরিচিত ও অজ্ঞাত লোকের বাসিন্দা হোক না কেন, বুদ্ধিবৃত্তিতে এরা পৃথিবীর মানুষের চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। আমাদের পৃথিবীতে হঠাৎ অন্য কোনো গ্রহ থেকে কোনো প্রাণী এসে উপস্থিত হলে

পৃথিবীর লোক তাকে নিয়ে যে রকম হৈ চৈ শুরু করে দিত, আমাকে নিয়ে এরা তা করছে না দেখে আমি মনে মনে আশ্বস্তই হলাম নিশ্চিন্তও হলাম এই ভেবে যে, আমাকে এরা অন্য যাই কেন না ভাবুক, শত্রু বলে ভাবছে না নিশ্চয়ই। আমার কেন যেন মনে হল যে, ভূপৃষ্ঠের অনেক অনেক নিচে মহাপাতালে এসে পড়েছি আমি।

তিন

(চক্ররথ)

মহাপাতালের প্রাণীটা কার সঙ্গে কী বার্তা বিনিময় করল জানি না, কিন্তু হঠাৎ আবছা অন্ধকারে বহু দূরে একটা উড়ন্ত কী একটা যেন বিপুল বেগে আমাদের দিকে ছুটে আসছে লক্ষ্য করলাম। দেখতে দেখতে শূন্য থেকে ভেসে আসা বস্তুটা আমাদের মাথার ওপরে শূন্যে এসে থেকে থামল, তারপর খাড়াভাবে আমার আর অদ্ভুত প্রাণীটার মাঝখানকার ছোট্ট জায়গাটুকুতে টুক করে নেমে পড়ল। তাকিয়ে দেখলাম, জিনিসটা চার ফুট ব্যাসের একটা বৃত্তাকার চাকতি, খাড়াই প্রায় এক ফুট, কেন্দ্র থেকে ওপরের দিকে উঠে আসা খাড়া মোটা দণ্ডটা প্রায় পাঁচ ফুট লম্বা, তার শেষে মথায় গোল একটা চাকা বসানো, যার গা থেকে নানা ধরনের লাল সবুজ নীল আর হলদে আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

আমার সঙ্গী প্রাণীটি চার পায়ে এগিয়ে এসে চাকতিটার ওপরে উঠে দাঁড়ালো, তারপর তার টেলিস্কোপিক বহুভাঁজ হাত বাড়িয়ে দিয়ে আমার হাত দুটো ধরে মৃদু আকর্ষণ করল। আমি তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম আর এও বুঝলাম যে, তার শারীরিক শক্তিও নেহাৎ অবহেলার যোগ্য নয়,—আমি তার আদেশ বা অনুরোধ না মানলে হয়তো সে জোর করবে আর সে জোর গ্রাহ্য না করবার মতো ক্ষমতা আমার হবে না।

এগিয়ে গিয়ে চাকতিটার ওপর উঠে দাঁড়ালাম, চাকতির মেঝেটা স্প্রিং-এর গদীর মতো নরম, আমি ওঠা মাত্র পা দুটো ভেতরের দিকে ডুবে গেল, খট্ করে একটা শব্দ হল, আমার পা দুটো শক্তভাবে এঁটে গেল।

এই সামান্য কয়েক পা হাঁটতেই আমি যেন হাঁপিয়ে পড়লাম, হাঁটবার সময়ে পা দুটোকে ভীষণ ভারী বলে মনে হচ্ছিল, সমস্ত শরীরের ওজন যেন তিন গুণ বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছিল, কিন্তু চাকতিটার ওপর উঠে দাঁড়াবা মাত্র মনে হল যে, আমার শরীর যেন পাখির মতো হাল্কা হয়ে গেছে, শরীরের যেন আর কোনো ওজনই নেই।

চাকতিটা নিঃশব্দে খাড়াভাবে সাঁ করে ওপরে উঠে গেল, তারপর তীরবেগে সেই প্রায়ান্ধকার দেশের আকাশ দিয়ে ছুটতে লাগলো, পড়ে যাবার ভয়ে আমি সেই দণ্ডটা আঁকড়ে ধরলাম। লক্ষ্য করলাম যে গ্রামোফোনের চাকার মতো দণ্ডটার মাথায় থাকা গোল চাকাটা অবিরাম ঘুরছে, বিভিন্ন রং-এর আলো থেকে চার থাক আলোক বৃত্ত রচনা করেছে, আমি বুঝতে পারলাম যে আমরা একটি স্বয়ংক্রিয় চক্ররথে আকাশে বিহার করছি।

ওপরের দিকে তাকিয়ে কোনো তারা বা চাঁদ দেখতে পেলাম না। অনুভব করলাম যে, এই অজানা দেশের আকাশ থেকে অজস্র ধীরে ইনফ্রা রেড রশ্মি অবিরাম ঝরে পড়ছে আর এ দেশটা তাই এত গরম। নিচের দিকে তাকিয়ে মাটি দেখতে পেলাম না। চারদিকে শুধু আলোক রেখাহীন আবছা অন্ধকারের নিঃসীম সমুদ্র।

আমার সঙ্গী প্রাণীটি তার স্বভাবসিদ্ধ স্তব্ধতায় ডুবে আছে, হয়তো কত কী ভাবছে আমার বিষয়ে, আমি যে বিশ্ব প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান মানুষ, সে তথ্যটা ওকে বোঝাবো কী করে তা ভেবে পেলাম না।

কোনো এক আশ্চর্য ব্যাপারে চোখ ধাঁধানো চমকটা কিছুক্ষণের জন্য মনকে বিস্ময় বিমূঢ় করে রাখে বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে মন তার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেতে দেরী করে না। চক্ররথে শূন্য বিহার করতে করতে হঠাৎ আমার হাতে বাঁধা দড়িটার কথা মনে পড়ল, হাতটা চোখের সামনে তুলে এনে সময় দেখবার চেষ্টা করলাম। রেডিয়াম ডায়াল ক্যালেণ্ডার ঘড়ির অক্ষর আর সংখ্যাগুলো অন্ধকারে ঝকঝক করছিল, সে দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বুঝতে পারলাম যে, হিমবাহে পড়ে অজ্ঞান হয়ে যাবার পর ঠিক দু'দিন পার হয়ে গেছে, পৃথিবীর কলকাতা নামে জায়গার সময় অনুসারে বেলা দশটা বেজেছে এখন।

আমি কি পৃথিবীতেই আছি না মহাশূন্যের কোনো এক বিচিত্র গ্রহের জীবলোকে পৌঁছে গেছি কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে? কিন্তু মাত্র দু'দিনের মধ্যে তাও বা কী করে সম্ভব? পৃথিবীর নিকটতম গ্রহে পৌঁছুতেও তো কয়েক আলোক ঘণ্টা দরকার। সময়ের হিসেব করে আমি বুঝতে পারলাম যে, আমি এই বিপুল বহু বিচিত্র বসুন্ধরারই কোনো এক অজ্ঞাত পরিচয় দেশে পৌঁছে গেছি এবং হয়তো সঙ্গী এই প্রাণীটিই অজ্ঞান অবস্থায় আমাকে এখানে নিয়ে এসেছে। কিন্তু তবু ভেবে পেলাম না যে জ্ঞান-বিজ্ঞানে এমন অভূতপূর্বভাবে উন্নত এই অদ্ভুত-দর্শন প্রাণী পৃথিবীর কোন অলক্ষ্য কোণে লুকিয়ে ছিল এতদিন। মানুষ আজ চাঁদে পাড়ি দিচ্ছে, গ্রহ-গ্রহান্তরে যাত্রা করবার তোড়জোড় করছে, কোটি কোটি মাইল দূরের ভান্তঃপ্রদেশে আবর্তনশীল ব্লু ডোয়ার্ফ ও লাল দৈত্য তারাগুলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করে তাদের তাপমাত্রার অঙ্ক নির্ভুলভাবে কষে ফেলেছে, আর পৃথিবীরই অভ্যন্তরে অবস্থিত এই অপরূপ বিস্ময়টাকে আবিষ্কার করতে কি করে অক্ষম হল আধুনিক যুগের কলম্বসরা?

মিনিট পনেরো নিঃশব্দে চলবার পর চক্ররথ খাড়াভাবে নিচের দিকে নামতে লাগলো। মাটির কাছাকাছি আসতেই আমি লক্ষ্য করলাম যে, নিচের মাটি ডাইনে-বাঁয়ে, সামনে পেছনে যতদূর দৃষ্টি যায় সর্বত্র একটা হাল্কা সবুজ আলোক ধারায় উদ্ভাসিত হয়ে আছে, হাজার কিম্ভুতদর্শন বিশালকায় যন্ত্র মাইলের পর মাইল দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে, আরও নিচে নেমে লক্ষ্য করলাম যে, আমার সঙ্গীর মতোই শত শত প্রাণী এই বিপুল যন্ত্রশালায় নিঃশব্দে কাজ করে চলেছে। স্পষ্টই বুঝতে পারলাম যে, আমি এই আশ্চর্য দেশের বিজ্ঞাননগরে পৌঁছে গেছি।

পৃথিবীর বড় বড় ল্যাবরেটরীর মধ্যে দু-চারটি যে আমি দেখিনি তা নয়, কিন্তু এই দেশের বিজ্ঞাননগরের কাছে সেগুলো নিতান্তই ছেলেখেলা, হাস্যাস্পদ ব্যাপার বলে মনে হল আমার। এই বিরাট বিজ্ঞাননগরে শত শত কর্মী ও বিজ্ঞানী এক মনে অবিরাম কাজ

করে যাচ্ছে, কিন্তু কোথাও কোনো শব্দ নেই, কোলাহল নেই, সমস্ত লোকের মধ্যে বিরাজ করছে এক অপরূপ শৃঙ্খলা। এদেশের এই শব্দহীন পরম নৈঃশব্দ আমার বুকের ওপর একটা পাষাণভারের মতো চেপে বসেছিল, এবার যেন সেই ভারটাকে আবার নতুন করে অনুভব করলাম।

একটা প্রকাণ্ড গোল চত্বরে আমাদের চক্ররথ নেমে পড়ল। আমার পা দুটো চক্ররথের সুদৃঢ় বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি পেল, আমার সঙ্গী তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল, দেখাদেখি আমিও তার অনুসরণ করলাম। এতক্ষণ চক্ররথের ওপরে বেশ ভারমুক্ত অবস্থায় ছিলাম, কিন্তু নিচে নামবার সঙ্গে সঙ্গে শরীরের সেই তিনগুণ ওজনটা ফিরে এল। সমস্ত শরীরটা ভীষণ ভারি বলে বোধ হতে থাকায় ভয়ানক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতে লাগলাম। আমার সঙ্গী কিন্তু অবলীলাক্রমে চলাফেরা করছিল, দেখে আমি তার প্রতি একটু ঈর্ষান্বিতই হলাম।

নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চারদিকে তাকালাম। ওপর থেকে এ এলাকাটাকে, যত বড় বলে মনে করেছিলাম, নিচে নেমে তাকে আরও বড়, আরও বিপুল, বিশাল বলে মনে হল। যন্ত্রগুলোও নানা আকারের নানা রং-এর। কোনো কোনোটা প্রায় দু'ফুট উঁচু, আবার কোনো কোনোটা আশি-নব্বুই ফুট উঁচু। সবচেয়ে মজার কথা যে, যন্ত্রগুলো কোনো ঘরে আবদ্ধ নেই, সবই উন্মুক্ত আকাশের নিচে সোজাসুজি মেঝের ওপরে বসানো। মেঝেটা মসৃণ, চিকণ, হালকা সবুজ আলোটা যেন মেঝেরই কোন অদৃশ্য ফাটল দিয়ে ওপরের দিকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, ফলে কী যে এক মায়াময় স্বপ্নছবির সৃষ্টি করেছে, তা ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না।

বিজ্ঞানী ও কর্মীদের ওপর থেকে আমার সঙ্গীর মতো বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু খুব কাছে থেকে দেখে বেশ কিছুটা পার্থক্য নজরে এল আমার। আমার সঙ্গীর সারা শরীর হাল্কা সবুজ রোম-এ ঢাকা, এই সবুজ আলোর বন্যায় সে প্রায় অদৃশ্যই হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখানকার কর্মরত প্রাণীদের কারুর সারা গা তীব্র লাল রং-এর ছোট ছোট রোমে ঢাকা, কারুর বা হলদে, কারুর গাঢ় নীল আবার অনেকে আমার সঙ্গীর মতোই হাল্কা সবুজ—বাগান ভরা মরসুমী ফুলের মতো অপরূপ বর্ণ বৈচিত্র্যে সমস্ত জায়গাটা যেন ঝলমল করছে।

আমাদের নামতে দেখে অল্প দূরের একটা মাঝারি আকারের যন্ত্রে কর্মরত দু'জন গাঢ় নীল রং-এর প্রাণী চার পায়ে ভর করে দ্রুত ছন্দে আমাদের দিকে এগিয়ে এল, আমার খুব কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো, তাদের ভাঁটার মতো চোখ দুটো দিয়ে অনেকক্ষণ ধরে আমার দিকে পলকহীনভাবে তাকিয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পরে একজন তার অ্যানটেনা বাড়িয়ে আমার ডান হাত স্পর্শ করল, সঙ্গে সঙ্গে একটা তীব্র বৈদ্যুতিক শক খেয়ে আমি লাফিয়ে উঠলাম। তখন ওরা তিনজন আমাকে ছেড়ে পরস্পরকে অ্যানটেনা স্পর্শ করে কী সব যেন পরামর্শ করতে লাগলো।

আমিই যে ওদের শলাপরামর্শের কেন্দ্রবস্তু তা বুঝতে আর বাকি রইল না। অসহায় নিশ্চুপভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। আমার পরনে তখন পর্বতারোহীর গরম পোশাক, পায়ে বরফে চলবার উপযোগী বিশেষ ধরনের বুট জুতো, পিঠে অকসিজেন সিলিণ্ডার আর মুখখানা স্বচ্ছ মাস্কে ঢাকা,—আমার এই পোশাক নিয়ে ওদের কাছে নিশ্চয়ই খুব একটা অপূর্ব দৃশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

একটু পরেই ডান দিকের নীল-রোম প্রাণীটি পরামর্শ শেষ করে দু'পা পেছনে হটে গেল, অ্যানটেনা দুটো আকাশের দিকে তুলে কী যেন একটা সঙ্কেত পাঠালো। অল্প দূর থেকে চারজন লাল-রোম প্রাণী অবিশ্বাস্য দ্রুত বেগে এগিয়ে এল, আমাকে ঘিরে ধরল, চোখের পলকে তারা তাদের টেলিস্কোপিক বহুভাঁজ হাত দিয়ে তৎপরতার সঙ্গে আমার মাস্ক, আমার পর্বতারোহীর গরম পোশাক, পায়ের ভারী কাঁটাওয়ালা জুতোটা সব খুলে নিল। আমি আবার বিদ্যুতের শক খাবার ভয়ে তাদের বাধা দেবার কথা ভাবতেই পারলাম না। কয়েক মিনিটের মধ্যেই শুধু প্রকৃতিদত্ত পোশাকটা পরে নির্লজ্জের মতো তাদের সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম। অবশ্য আমার লজ্জা পাবার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল না, কারণ এই বিচিত্র দেশের অতি বুদ্ধিমান প্রাণীরাও কৃত্রিম পোশাকে তাদের নগ্নতা ঢেকে রাখাটা বাহুল্য বলেই মনে করেছে।

আমার সঙ্গী হালকা সবুজ প্রাণীটি এতক্ষণ একপাশে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, সে এবার এগিয়ে এসে তার টেলিস্কোপিক বহুভাঁজ হাত দিয়ে আমার ডান হাতটা স্পর্শ করে যেন তাকে অনুসরণ করতে ইঙ্গিত করে এগিয়ে গেল। আমি ভারী পা নিয়ে অতি কষ্টে তাকে অনুসরণ করলাম। নীল আর লাল প্রাণী দু'জন আমার পেছনে পেছনে আসতে লাগল। আশপাশের অন্যান্য প্রাণীরা কিন্তু এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখেও বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করল না, একবার শুধু, তাদের ভাঁটার চোখ দুটি দিয়ে আমাকে দেখে নিয়ে নিজের নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

হালকা সবুজ-রোম প্রাণীটির পেছনে পেছনে বেশ কিছু দূর হাঁটতে গিয়ে আমি বেশ হাঁপিয়ে পড়ছিলাম আর অনুমানে তাই বুঝতে পেরেই বোধ হয় সে মাঝে মাঝে থেমে পড়ছিল। আমি বেশ বুঝতে পারলাম যে, এই বিচিত্র দেশের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাদের পৃথিবীর প্রায় তিন গুণ আর সে জন্যই হাঁটাচলা করতে আমার এত কষ্ট হচ্ছে। ইচ্ছে হচ্ছিল যে, চুপচাপ শুয়ে পড়ি এই মায়াময় মসৃণ চিক্কণ মেঝের ওপর। কিন্তু বিদ্যুতের কষাঘাতের স্মৃতি আমার মন থেকে তখনও মুছে যায়নি বলে তা করতে সাহস পেলাম না। তা ছাড়া কেন যেন মনে হচ্ছিল যে, এই অতি বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমার কোনো অনিষ্ট করবে না, বিশেষ করে আমার হাল্কা সবুজ-রোম সঙ্গীটিকে তো উপকারী বন্ধু বলেই মনে হল।

পোশাক ও অকসিজেন মাস্ক খুলে নেওয়ার ফলে আমি বুঝতে পারলাম যে, বায়ুর চাপও এখানে দেড় কিম্বা দুই এ্যাটমোস্ফিয়ার। কিন্তু বাতাসে প্রচুর অকসিজেন থাকতে শ্বাস নিতে বেশি কষ্ট হচ্ছিল না। যেখান থেকে চক্ররথে চড়ে এলাম সে জায়গার তুলনায় এখানকার তাপমাত্রাও বেশ কম, এমন কি আগের জায়গায় গরমে আমি ঘামছিলাম,কিন্তু এখানে আসার পর থেকে বেশ শীত শীত করছিল।

প্রায় কুড়ি মিনিট থেমে থেমে চলবার পর প্রায় দু'মানুষ উঁচু দশ ফুট ব্যাসের গোল মতো একটা যন্ত্রের সামনে গিয়ে থামলাম আমরা। কমলালেবু রং-এর যন্ত্রটা যে কী ধাতু দিয়ে তৈরি তা, বুঝতে পারলাম না। তার মাথার দিকে ছোট একটা রডে বসানো

পিরামিড আকৃতির অংশটা বন বন করে ঘড়ির বিপরীত আবর্তন চক্রে ঘুরছিল। আমি তার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার পর হয়তো আমার পেছনে থাকা নীল রোম প্রাণী দুটির কোনো এক সঙ্কেতে যন্ত্রটার অংশ এক পাশে সরে গেল, ভেতর থেকে এক ঝলক তীব্র হলদে আলো ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার মুখে চোখে সর্ব শরীরে, আমার স্নায়ুমণ্ডলী যেন চোখের পলকে অসাড় হয়ে গেল। আমার সঙ্গী সবুজরোম প্রাণীটি তার বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাতটা আমার পিঠে ঠেকিয়ে মৃদু ঠেলা দিল। বুঝলাম যে, আমাকে ওই যন্ত্রটার গহ্বরে ঢোকবার জন্য বলা হচ্ছে। আতঙ্কে আমার চুলগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে গেল, আমি ভয়ার্ত চোখে এদিক ওদিক তাকাতে লাগলাম। আমাকে দেখে অসহিষ্ণু নীলরোম প্রাণী দু'জন আমার দু'পাশে এসে দাঁড়াল, তাদের অ্যানটেনা কাছাকাছি আসতেই ভারী বাতাস চিরে একটা নীলাভ তীব্র আলো দেখিয়ে স্পার্কিং হল। এবার আমি বুঝতে পারলাম যে, অদ্ভুত প্রাণীরা বিদ্যুৎ তরঙ্গের সাহায্যেই পরস্পরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করে, আবার প্রয়োজন হলে এই অ্যানটেনা দুটোই ভয়ানক শত্রুপীড়কের ভূমিকা নিতে পারে অনায়াসে। অবশ্য এই সব তথ্যগুলো আমার মাথায় খেলেছিল বেশ কিছুক্ষণ পরে, কারণ স্পার্কিং দেখা মাত্রই আমি ভয়ে ভাবনায় চিৎকার করে উঠলাম। সবুজ প্রাণীটি দ্রুতপদে এগিয়ে এল, নীলরোমদের কী যেন সঙ্কেত করল, নীলরোম দু'জন একটু পেছনের দিকে সরে গেল। তখন সবুজ সঙ্গী তার বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাত দিয়ে নিবিড়ভাবে আমার হাত ধরল। তার স্পর্শে যেন আমি অভয় পেলাম, আমার আত্মবিশ্বাস ফিরে এল, পলকের জন্য একবার দ্বিধা করে আমি ওই ছোট্ট ফোকর দিয়ে যন্ত্রটার ভেতরে ঢুকে গেলাম।

সঙ্গে সঙ্গে পেছনের দরজাটা নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল।

চোখ ধাঁধানো তীব্র হলদে আলোকে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্য আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। অনুভবে বুঝলাম যে, এই ঘরটার মেঝেও চক্ররথের মেঝের মতোই নরম। সমুদ্রের ঢেউ-এ দোল খাবার মতো দুলতে দুলতে শেষটার স্থির হয়ে গেল আমার শরীর। আলোকটাও ক্রমে ক্রমে সয়ে এল চোখে।

অস্বীকার করব না যে, প্রথমটায় বেশ একটু বিচলিত বোধ করছিলাম, আশঙ্কা করিছলাম যে, এই আশ্চর্য প্রাণীরা বুঝি আমাকে মেরে ফেলবার জন্যই এই যন্ত্রের ভেতরে পুরেছে। এখন কিন্তু সে কথা ভাবলে হাসিই পায়। আমাকে মেরে ফেলাই যদি ওদের উদ্দেশ্য হত, তবে আর এত আড়ম্বরের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে এখানে আনবার প্রয়োজন কী ছিল? দু'তিনটি বৈদ্যুতিক কশাঘাতেই তো সে কাজ অনেক আগেই সুসম্পন্ন হতে পারত। কিন্তু আতঙ্ক এমনভাবেই স্বাভাবিক বুদ্ধিকে বিপর্যস্ত করে দেয় যে, সহজ সত্যটা তখন আর চোখেই পড়ে না।

ভয়ের প্রথম ধাক্কাটা কেটে যেতে আমি যন্ত্রটার ভেতরের চারদিকে তাকালাম। মাথার ওপর বৃত্তাকার ছাদ থেকে আলোক রশ্মি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে, খাড়া গোল দেওয়াল ম্যাজেন্টা রং-এর, তার গায়ে নানা ধরনের গোল, ত্রিভুজাকার মিটার বসানো, তাতে কি সব অবোধ্য বিচিত্র সঙ্কেত আঁকা। চারদিকে নানা রং-এর সূক্ষ্ম তারের সমাবেশ।

মেঝের ঠিক মাঝখানে একটা গোল মতো টুল দেখতে পেলাম। একটু ইতস্তত করে তার ওপর বসে পড়লাম, টুলটা আমার ওজনে অনেকটা নিচে নেমে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে ছাদ থেকে বিচ্ছুরিত হলদে আলোর প্লাবন অদৃশ্য হয়ে গেল, চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল একটা গোলাপী আলো, মিটারগুলোর নির্দেশ শলাকাগুলো সক্রিয় হয়ে উঠল, একটা অস্পষ্ট আওয়াজে যন্ত্রের ভেতরটা ভরে গেল। এই পরম নৈঃশব্দ্যের রাজ্যে এই অস্ফুট গুঞ্জন ধ্বনি শুনতে শুনতে আমার মনপ্রাণ আনন্দে ভরে উঠল।

হঠাৎ আমার খুব গরম বোধ হতে লাগল, মনে হল যে অবলোহিত আলোক রশ্মি এই যন্ত্রের কোনো এক অজ্ঞাত কেন্দ্র থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তার তাপে আমার শরীরের চামড়া যেন পুড়ে যেতে চাইল।

এমন সময়ে আমার ঠিক সামনে যন্ত্রটার চকচকে প্লেটের গায়ে চোখ পড়তে আমি চমকে উঠলাম, এক্স-রে স্ক্রিনে যেমন কঙ্কালের ছায়া ফুটে ওঠে, তেমনি ওই প্লেটে আমার হাড়, শিরা উপশিরা, স্নায়ুমণ্ডলী মাংসপেশী সব পর পর ভেসে উঠল। আমি ধমনী ও শিরার ভেতর দিয়ে রক্ত কণিকাগুলির অবিরাম সঞ্চরণ লক্ষ্য করলাম, সদা তৎপর নার্ভতন্ত্র, মস্তিষ্কের মহাজটিল গঠন, ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ সব কিছুই একের পর এক ওই প্লেটের গায়ে ফুটে উঠল। বুঝতে পারলাম যে, বাইরে দাঁড়ানো ওই বুদ্ধিমান প্রাণীরা আমার অ্যানাটমী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হবার উদ্দেশ্যেই আমাকে এই যন্ত্রের গহ্বরে পুরেছে। প্রয়োগ বিজ্ঞানে তাদের এই বিস্ময়কর উৎকর্ষ দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম।

দেখতে দেখতে দু'ঘণ্টা কেটে গেল, তারপর এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস আমার চোখে মুখে ও সারা শরীরে হাল্কা শীতল স্পর্শ বুলিয়ে দিল, টুলটা আমাকে ঠেলে তুলে দাঁড় করিয়ে দিল, লক্ষ্য করলাম যে, যন্ত্রের ভেতরটায় আবার হলদে আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

যন্ত্রটার রুদ্ধ দুয়ার খুলে গেল, বাইরে আমার পরিচিত সেই সবুজ প্রাণীটির মুখ দেখতে পেয়ে অনেক দিনের অদর্শনের পর প্রিয়জনকে দেখতে পারার আনন্দ অনুভব করলাম আমি।

বাইরে এসে দেখলাম যে, হলদে রোম আট-দশটি প্রাণী ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে অ্যানটেনা ঘষে ঘষে কোন দুরান্তরে যেন সঙ্কেত পাঠাচ্ছে। বুঝলাম যে, এরাই এদেশের ধুরন্ধর সাংবাদিক, নিজের নিজের পত্রিকা সম্পাদকের কাছে তাদের রাজ্যে এক অদ্ভুত প্রাণীর আবির্ভাবের যাবতীয় তথ্য সরবরাহ করছে।

আমি বাইরে এসে সবুজ সঙ্গীর পাশে দাঁড়ালাম, সেতার বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাত লম্বা করে আমার হাত চেপে ধরল, বুঝলাম যে, এটা তার বন্ধুতারই নিদর্শন।

এমন সময়ে চারদিকের হালকা সবুজ আলোর বুক চিরে একটা তীব্র সার্চ লাইটের মতো উজ্জ্বল সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল। আলোটা আমাদের সামনে এসে কেন্দ্রীভূত হল। আমি মাথা তুলে তাকিয়ে দেখলাম যে, একটা মস্ত চক্ররথ ওপর থেকে নিচে নেমে আসছে বিদ্যুৎ বেগে।

হলদে, লাল আর নীল রোম প্রাণীরা লাইন দিয়ে দাঁড়াল, অ্যানাটেনাগুলো উর্ধ্বমুখী করে মাথা নিচু করে তারা তাদের টেলিস্কোপিক বহুভাঁজ হাতগুলো ছোট করে ফেলল।

চক্ররথ ভূমি স্পর্শ করা মাত্র আমার সবুজ সঙ্গী দ্রুতপদে এগিয়ে গেল। চক্ররথের আরোহী ছিলেন একজন বেগুণী-রোম প্রাণী। সবুজ-সঙ্গী যেভাবে পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করে তাঁকে নামিয়ে আনল, তা লক্ষ্য করে আমি বুঝতে পারলাম যে, ইনি এদেশের মস্ত কেউ হবেন নিশ্চয়।

শ্রেণীবদ্ধ লাল-হলদে-নীল-রোম প্রাণীদের দিকে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার তাকিয়ে বেগুণী-রোম প্রাণীটি আমার সবুজ সঙ্গীর হাত ধরে রাজকীয় মর্যাদার সঙ্গে চক্ররথ থেকে নেমে এসে আমার সুমুখে দাঁড়ালেন। চক্ররথের ওপর একটা চোঙা-অলা বিচিত্র গঠন যন্ত্র ছিল, হলদে লাল আর নীল-রোম প্রাণীরা সেটা সাবধানে নামিয়ে এনে আমার বাঁ পাশে রাখল। লক্ষ্য করলাম যে, যন্ত্রটা অনেকটা পোর্টেবল ওয়েল্ডিং মেশিনের মতো দেখতে, মাথার ওপরে পুরনো দিনের হিজ মাস্টার্স ভয়েস গ্রামাফোনের চোঙের চেয়ে প্রায় চার গুণ বড় চোঙ ফিট করা।

বেগুনী-রোম মান্যগণ্য ব্যক্তিটি তাঁর বিশাল চোখ দুটি দিয়ে আমাকে খুঁটিয়ে দেখলেন অনেকক্ষণ, তাঁর বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাতখানা বাড়িয়ে আমার নিরাবরণ শরীরে বুলিয়ে দেখলেন। তাঁর স্পর্শে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সম্বন্ধে তাঁর কৌতূহলের নিবৃত্তি ঘটেছে বলে মনে হল, কারণ তিনি আমার সবুজ সঙ্গীকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে তাঁদের দেশের নিজস্ব ভাষায় কী কী যেন বলাবলি করলেন, দু'একবার মাথা ঘুরিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকালেন। আর ততক্ষণ ধরে হলদে লাল আর নীল-রোম প্রাণীরা মাথা নিচু করে লাইন দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আমাদের দেশের ভি.আই.পি-দের মতোই বেগুনী-রোম ভি.আই.পি-ও বেশিক্ষণ জনসমাজে রইলেন না, সবুজ সঙ্গীর পিঠে একটা চাপড় মেরে হয়তো বা হাসতে হাসতে চক্ররথে গিয়ে উঠলেন। চোখের পলকে চক্ররথ খাড়াভাবে আকাশে উঠে গেল, তারপর আরব্য রজনীর ম্যাজিক কার্পেটের মতো শূন্যে ভাসতে ভাসতে দূর থেকে দুরান্তরে মিলিয়ে গেল।

সবুজ সঙ্গী ক্ষিপ্র পদে আমার পাশে এসে দাঁড়াল। তার হাবভাব দেখে মনে হল যে, সে আনন্দে একেবারে ডগমগ করছে।

এতক্ষণ ধরে এদের সঙ্গে থেকে আর ভি.আই.পি-র আচরণ লক্ষ্য করে বুঝলাম যে, আমার সবুজ সঙ্গীটিও নেহাৎ হেলাফেলার লোক নয়, এদের সমাজে তার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে, এমন কি হলদে, লাল ও নীল-রোম প্রাণীদের তুলনায় তার আসন অনেক উঁচুতে।

সবুজ সঙ্গী আমার পাশে দাঁড়িয়ে কী যেন বলল তার অ্যানটেনা নেড়ে, সঙ্গে সঙ্গে হলদে আর লাল-রোম প্রাণী ক'জন, ওই চোঙা লাগানো যন্ত্রটি ঠেলতে ঠেলতে আমার সামনে নিয়ে এল। নীল-রোম প্রাণী কী একটা স্যুইচ অন করে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে স্বচ্ছ প্লাস্টিকের মতো কী একটা ধাতুর আবরণে ঢাকা তিনটি স্পিণ্ডল বন বন করে নিঃশব্দে ঘুরতে লাগল। একটা প্লেড কাটা পিলারের ওপর বসানো চোঙাটা আমার মাথা ছাড়িয়ে ওপরে উঠে ছিল, দ্বিতীয় নীল-রোম প্রাণী অন্য একটা সুইচ অন করে ওটাকে আমার মুখের সমান করে নামিয়ে আনল। আমি লক্ষ্য করলাম যে, চোঙাটার সরু দিকে একটা মাইক্রোফোনের মতো কী একটা যন্ত্র ফিট করা আছে। আমি আমার তিনগুণ ওজন সামলে ঘুরে একটু এগিয়ে চোঙের বড় মুখটার দিকে তাকালাম। দেখলাম যে, খোলা মুখটা একটা পাতলা কিন্তু অস্বচ্ছ পর্দা দিয়ে ঢাকা।

দেখলাম যে, যন্ত্রটার নিচের ইলেকট্রিক ওয়েল্ডিং মেশিনের মতো অংশ থেকে অসংখ্য সরু মোটা ইনসুলেট করা তার চোঙাটার ভেতরে ঢুকে গেছে।

আমি যতক্ষণ এইসব পর্যবেক্ষণ করছিলাম, ততক্ষণ সবুজ সঙ্গী চুপচাপ আমার মুখে তাকিয়ে ছিল। আমি তাঁর পাশে ফিরে গিয়ে দাঁড়াতেই সে দু'হাতে আমার মাথাটা চেপে ধরে চোঙের মাইক্রোফোনের কাছে নিয়ে গেল।

আমি তার ইঙ্গিত বুঝতে পারলাম। মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে বললাম,—"আমার নাম অরবিন্দ মজুমদার,—আমি পৃথিবীর মানুষ—"

আমার কথাটা শেষ হওয়া মাত্র যন্ত্রটার নিচের অংশ থেকে একটা দরজা খুলে গেল,—পাতলা প্লাস্টিকের মতো ধূসর রং-এর একটা টুকরো বেরিয়ে এল, সবুজ সঙ্গী তার টেলিস্কোপিক হাত বাড়িয়ে চট করে তুলে নিল সেটা।

নীল রোম প্রাণী দু'জন আর সবুজ সঙ্গী সে জিনিসটা হাতে নিয়ে কী যেন দেখল কিছুক্ষণ ধরে, অ্যানটেনার কম্পনে কী সব বার্তা বিনিময় করল,তারপর একজন নীল রোম প্রাণী যন্ত্রটার ওপরের একটা ঢাকনা খুলে ভেতরের যন্ত্রপাতিগুলোকে কি সব পরিবর্তন করে আবার ঢাকনাটা বন্ধ করে দিল।

সবুজ সঙ্গী আমাকে সরিয়ে দিয়ে তার অ্যানটেনা দুটো মাইক্রোফোনের সামনে নিয়ে কী এক সঙ্কেতে কাঁপিয়ে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে পুলকিত বিস্ময়ে শুনলাম যন্ত্রের ভেতর থেকে কে যেন কথা ক'য়ে উঠল : আমার নাম অরবিন্দ মজুমদার। আমি পৃথিবীর মানুষ—

আমি আনন্দের অতিশয্যে সবুজ সঙ্গীর অ্যানটেনা চেপে ধরতে গিয়ে শক্ খেলাম, কিন্তু ও আমার মনোভাব বুঝতে পেরে ওর টেলিস্কোপিক হাত দিয়ে আমার হাত চেপে ধরল। বুঝলাম যে, ওর এই এক্সপেরিমেণ্টটা সফল হওয়ায় ও নিজেও কিছু কম খুশি হয়নি।

এতক্ষণে আমি বুঝতে পারলাম যে, এই যন্ত্রটা আসলে একটা ইলেকট্রিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্র। আমার ভোকাল কর্ড যে ফ্রিকোয়েন্সির স্বরতরঙ্গ সৃষ্টি করেছে, তা এই যন্ত্রটা সবুজ সঙ্গীর অ্যানটেনা গ্রাহ্য ফ্রিকোয়েন্সি পরিবর্তিত করেছে, তা ছাড়া আমার কথাটার সঠিক অর্থ ওদের ভাষায়ও রূপান্তরিত করেছে।

এরপর প্রায় চার ঘণ্টা ধরে আমাদের কথার আদান-প্রদান চলল। দেখতে দেখতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সবুজ সঙ্গী বাংলা ভাষার সঙ্গে বিলক্ষণ পরিচিত হয়ে গেল। ও আমাকে প্রশ্ন করল, "তুমি কোথাকার বাসিন্দা?—"

আমি বললাম,—"আমি পৃথিবীর মানুষ।"

"পৃথিবীতে আর কত মানুষ আছে?"

"কোটি কোটি—"

"সবাই কি তোমার মতো?"

"না, তোমাদের মধ্যেও যেমন নানা রং-এর প্রাণী আছে, মনুষ্য সমাজেও তেমনি নানা গোষ্ঠীতে বিভক্ত, কিন্তু তোমরা কে? এ আমি কোন্ দেশে এসেছি?"

সবুজ সঙ্গী ইলেকট্রিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্রের ভেতর দিয়ে বলল,—"আমরা সিম্বিলিকোলাপ্টা, এ দেশটার নাম সিম্বিলি, তোমাদের ভাষায় বলতে পারো মহাপাতাল—"

মহাপাতাল। শুনে আমার আর বিস্ময়ের সীমা পরিসীমা রইল না, বলে উঠলাম,—"সে কি?"

উত্তর এল, "হ্যাঁ,—পৃথিবীর গহন গভীরে, তোমাদের দেশ থেকে দু'হাজার মাইল নিচে আমাদের মহান দেশ সিম্বিলি, আর এখানে উদ্ভব হয়েছে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিক্ষায়-শিল্পে অতি উন্নত এক জাতির, যার নাম সিম্বিলিকোলাপ্টা—"

প্রয়োগ বিজ্ঞানে এদের আশ্চর্য দক্ষতার কথা আমি অস্বীকার করতে পারলাম না। ভেবে দেখলাম যে, পৃথিবীতে যদি হঠাৎ মঙ্গলগ্রহ থেকে কোনো মঙ্গল মানুষ এসে উপস্থিত হয়, তবে পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এত অল্প সময়ের মধ্যে কিছুতেই তার সঙ্গে ভাব বিনিময় করতে পারবে না।

আকস্মিক উত্তেজনা যত তীব্র হয়, অবসাদও আসে তত তাড়াতাড়ি। তাছাড়া মহাপাতালের অত্যধিক মাধ্যাকর্ষণ আমার শরীরের প্রতি অঙ্গে অসহ্য বেদনার সঞ্চার করছিল, মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল। আমি যেন আর দাঁড়াতে পারছিলাম না।

সবুজ সঙ্গী বুঝি বুঝতে পারল আমার মনের কথা। তার ইঙ্গিতে নীল রোম প্রাণী দু'জন যন্ত্রটাকে ঠেলে দূরে নিয়ে গেল। হলদে আর লাল রোম প্রাণী ক'জন তাদের নিজের নিজের কাজে চলে গেল।

সবুজ সঙ্গী তার অ্যান্টেনার কম্পন জাগিয়ে কোথায় কী বার্তা পাঠালো, একটু পরেই কোত্থেকে যেন একটা চক্ররথ উড়ে এল, নেমে পড়ল আমাদের সুমুখে। চক্ররথের আরোহী ছিল একটি সবুজ রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা, সে চক্ররথ থেকে নিচে নেমে এল, তার হাতে ছিল আমার পোশাকগুলো। আমি প্যান্ট আর সার্ট শুধু পরলাম। কারণ এখানে হিমালয়ের দুর্জয় শীত না থাকার জন্য গরম জ্যাকেট, বা মাস্ক পরবার কোনো দরকার ছিল না। আমার নিজের জুতোর বদলে ওরা একরকম নমনীয় ধাতুতে তৈরি ঠিক আমার জুতোর মাপের অন্য এক জোড়া জুতো দিল। সবুজ সঙ্গী সেটা পরবার জন্য ইঙ্গিত করাতে আমি সেটা পরে ফেললাম আর সঙ্গে সঙ্গে তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলাম।

আমার ওজন যেন পৃথিবীর তুলনায় অর্ধেক হয়ে গেছে।

সিম্বিলিকোলাপ্টা কীভাবে হাসে তা তখনও জানি না, কিন্তু আমার আনন্দ দেখে সবুজ সঙ্গী যেন মিটিমিটি হাসল বলে মনে হল আমার।

আর একবার আলোক খাদ্য খেয়ে আরও একটু চাঙা হয়ে উঠলাম আমি। তখন সবুজ সঙ্গী আমাকে নিয়ে চক্ররথে চাপল, অন্য সবুজ-রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা ওখানেই রয়ে গেল।

চক্ররথ আকাশে উড়ল।

সেই হালকা সবুজ আলোর রাজ্য ছাড়িয়ে নীলাভ আলোর সীমা পেরিয়ে গোলাপী আলোর দেশে গিয়ে পৌঁছলো আমাদের চক্ররথ, তারপর ছোট্ট একটা সমতল ভূমিতে নামলো।

সুসম স্নিগ্ধ গোলাপী আলোতে দু'চোখ জুড়িয়ে গেল। এখানে হালকা সবুজ আলোর দেশের বিজ্ঞানশালার যন্ত্রপাতি বা নীলাভ আলোর দেশের পর্বতপ্রমাণ কলকারাখানা নেই, যে দিকে চোখ যায় শুধু ধু ধু করা প্রান্তর, যেন কোন দূর দিকচক্রবালে গিয়ে মিশেছে।

সবুজ সঙ্গী আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে গেল, লক্ষ্য করলাম কিছু দূরে মাটির বুকে কুয়ার মতো বড় বড় গর্ত, তার তিন দিকে রেডিয়ামের মতো উজ্জ্বল ধাতুর রেলিং দিয়ে ঘেরা।

ওইরকম একটা কুয়ার ধারে আমাকে নিয়ে গেল আমার সবুজ বন্ধু। আমি উঁকি দিয়ে দেখলাম যে, অনেক নিচে থেকে একটা আয়তাকার উজ্জ্বল ধাতুর পাদানী যেন পাতালের অতল থেকে উঠে আসছে। পাদানীটা উঠে এসে কুয়ার পাড়ের সঙ্গে লাগলো; সবুজ বন্ধু আর আমি তার ওপর উঠলাম আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা নিঃশব্দে নিচে নেমে যেতে লাগলো পাতালপুরীর দিকে। আমি ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে সবুজ বন্ধুর হাত চেপে ধরলাম।

অনেকক্ষণ চলবার পর পাদানীটা যখন থামলো, তখন হাঁপ ছেড়ে দেখলাম যে, মৃদু গোলাপী আলোর উদ্ভাসিত এক মায়ারাজ্যে উপস্থিত হয়েছি আমি।

মাধ্যাকর্ষণ শক্তি-নিরোধ ধাতুর জুতো পরে শরীর এতই হালকা লাগছিল যে, সবুজ বন্ধু আমাকে নানান জায়গা ঘুরিয়ে যখন তার বাড়িতে নিয়ে গেল, তখনও আমি বিন্দুমাত্র ক্লান্তি বোধ করছিলাম না।

এখানকার বাড়িগুলো সব পিরামিডের মতো,—ওপরের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে উঠে গেছে। নিরন্ধ্র হেলানো দেওয়ালে দরজার চিহ্নমাত্র নেই, আঁকা আছে শুধু একটা সবুজ তীর। সবুজ বন্ধু সেই তীরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই দেওয়ালের একটা অংশ একদিকে সরে গেল কোলাপিস্‌বল গেটের মতো। দরজার সুমুখে সাদা রোম একটি সিম্বিলিকোলাপ্টা দাঁড়িয়ে ছিল, সবুজ সঙ্গীকে দেখেই ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল তাকে। অনুমানে বুঝলাম, এটি নিশ্চয়ই সবুজ বন্ধুর প্রেয়সী বধূ। আলিঙ্গনের সমারোহ দেখে মনে হল যেন বহুদিন প্রবাসী থাকার পর গৃহসমাগত হয়েছে আমার সবুজ বন্ধু।

ওদের দু'জনের মধ্যে সানুরাগ কী কী বার্তার বিনিময় হল জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে সাদা রোম সিম্বিলিকোলাপ্টার গৃহিণী

আমার দিকে ঘুরে তাকালো, দেখলাম যে,তার চোখ দুটো এ দেশের পুরুষদের মতো ভাঁটার মতো গোল নয়, বেশ টানা টানা। দেখে বড় ভাল লাগলো, ভাবলাম যে, আমাদের আধুনিক কবি বিলীয়মান বোস যদি এ চোখ দুটি একবার দেখতে পেত তবে কতই না দুর্বোধ্য কবিতা লিখে তার মোটা মোটা খাতাগুলো ভরে ফেলত। আমি কবি নই, তবু সবুজ বন্ধুর স্ত্রীর ছিমছাম সুন্দর চেহারাটি ভারী ভাল লাগলো।

সবুজ বন্ধু ও তার স্ত্রী পরম সমাদরে আমাকে তাদের ঘরে নিয়ে গেল। এদেশের আলোর উৎস যে কোথায় তা আমি জানতে পারিনি, কিন্তু ঘরের ভেতরে যেন গোলাপী বন্যা খেলে যাচ্ছিল। ঘরের মেঝেতে পা দিতেই রবার-কুশন গদীর মতো ডুবে গেল আমার পা।

দেওয়ালের কাছে গিয়ে সবুজ বন্ধু একটা সুইচ টিপে দিতেই ছাদ থেকে কতগুলো বিদ্যুৎ তরঙ্গের আঁকাবাঁকা স্রোত আমার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ল। ভয় পেয়ে তাকিয়ে দেখলাম যে, শুধু আমি নই, সবুজ বন্ধু ও তার স্ত্রী সাদা শরীরের ওই বিদ্যুতের তরঙ্গ স্রোত ছড়িয়ে পড়ে তাদের যেন এক ধূমহীন জ্যোতিশিখায় পরিণত করেছে।

বিদ্যুৎ তরঙ্গে স্নান শেষ হতেই পরম আরামে আমার দু'চোখের পাতা সীসার মতো ভারী হয়ে এল। আমি সেই নরম মেঝের গদীতে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

চার
(মহাপাতালের ইতিহাস)

দিন সাতেক কেটে গেল।

এরই মধ্যে আমি মহাপাতালের হালচালে বেশ অভ্যস্ত হয়ে উঠলাম। আলোক-খাদ্য আর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ-স্নানকে মনে মনে ভালবেসে ফেললাম।

এরই মধ্যে জানতে পারলাম যে, আমার সবুজ সঙ্গীর নাম অশ্চলবলগল। তার স্ত্রী বিম্বিলিবিলিকিলি আমার সঙ্গে ঠিক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার মতোই ব্যবহার করছিল।

আমাকে তার বাড়িতে নিয়ে যাবার দিন দুই পরে অশ্চলবলগল দুটো পোর্টেবল স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রিক কম্পিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর মেশিন নিয়ে এল। একটা লাল আর একটা সাদা। লালটা সে নিজের কাছে রেখে দিল, সেটাতে ছিল তার ভাষার কথাগুলোকে বাংলায় রূপান্তরিত করে আমার শ্রবণ-গ্রাহ্য ধ্বনি তরঙ্গ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা, আর সাদাটা রইল আমার পকেটে, ইচ্ছে হলেই বার করে তার মাউথপিসে কথা বলতাম বাংলাতেই, সঙ্গে সঙ্গে সেটা সিম্বিলিকোলা ভাষায় অনূদিত হয়ে তাদের অ্যানটেনা গ্রাহ্য ধ্বনিতরঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত। মহাপাতালের সিম্বিলিকোলাপ্টা জাতির বিস্ময়কর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা দেখে আমি থ মেরে গেলাম।

এদেশে সকাল সন্ধ্যে নেই, কিন্তু সময়ের একটা হিসেব ওরা রাখে নিশ্চয়, কিন্তু কি করে তা আমি জানতে পারিনি। তবে আমার ঘড়ি থেকে বুঝেছিলাম যে, এদেশে বত্রিশ ঘণ্টা দিন আর বত্রিশ ঘণ্টা রাত্রি। প্রত্যেক পুরুষকে অন্তত আঠারো ঘণ্টা কাজ করতে হয়। মেয়েরা কাজ করে বারো ঘণ্টা। এদেশে রান্নাবান্নার কোনো হাঙ্গামা নেই, হাঙ্গামা নেই দোকানপাটের, তাই অবিচ্ছিন্ন কর্মের চাকায় নিজেদের বেঁধে রাখতে এদের বাধে না।

অশ্চলবলগল আর তার স্ত্রী বিম্বিলিবিলিকিলি রোজ সকালে বেরিয়ে যায় আর ফেরে সেই বিকেলে। এই সময়টা আমি অশ্চলবলগলর লাইব্রেরিতে কাটাই। এদেশে কোনো বই নেই, টেপ রেকর্ডের রিলের মতো কতগুলো রিল আছে। এই রিলগুলো একটা লম্বা উঁচু মেশিনে ফিট করতে হয়। মেশিনটি চালু হলে অদৃশ্য এক রশ্মি মস্তিষ্কের স্নায়ুকেন্দ্রগুলিকে এক বিশেষ তরঙ্গে উত্তেজিত করে, ফলে রিলে আবদ্ধ বিশেষ জ্ঞান আপনা থেকেই জানা হয়ে যায়। আমি এইভাবে এদেশের ভূগোল, অর্থনীতি, সমাজনীতি আর প্রাচীন ইতিহাস জেনে ফেললাম।

ভূপৃষ্ঠে যে সময়ে বিবর্তনের পথে নিয়ণ্ডারথাল মানবের জন্ম হয়, ঠিক সেই সময়ে অতিকায় পিপীলিকা শ্রেণী থেকে সিম্বিলিকোলাপ্টার পূর্বপুরুষের উদ্ভব হয়। তারা প্রথম তুষার যুগের মৃত্যু শীতলতায় হাত এড়াবার জন্য একটা মৃত আগ্নেয়গিরির ফাটল দিয়ে মাটির বহু নিচের রমণীয় উষ্ণতায় আশ্রয় নেয়। তারা আর ওপরে উঠে আসে নি, হাজার হাজার বছর ধরে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে ক্রমেই নিচের দিকে নেমে যেতে থাকে। নিয়ণ্ডারথাল মানুষ থেকে যেমন আজকের এই জ্ঞানে-বিজ্ঞানে উন্নত ভূপৃষ্ঠের মনুষ্য সমাজের উদ্ভব হয়েছে, বহু লক্ষ বছরের বিবর্তনের ফলে, ঠিক তেমনিভাবে সেই অতিকায় পিপীলিকা শ্রেণী থেকে বহু বিবর্তনের পথ বেয়ে উদ্ভূত হয়েছে আজকের সিম্বিলিকোলাপ্টা জাতি। তারা যে জ্ঞানে ও বিজ্ঞানে ভূপৃষ্ঠের মানুষদের অনেক পেছনে ফেলে এগিয়ে গেছে, তার প্রমাণ তো আমিই ভূরি ভূরি পেয়েছি এই অল্প সময়ের মধ্যে।

সন্ধ্যার অনেক আগেই ফিরে আসতো বিম্বিলিবিলিকিলি। আমার ঘরে একবার উঁকি মেরে লেগে যেত ঘর দুয়ার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার কাজে। কাজটা শক্ত কিছুই নয়, প্রত্যেক ঘরে একটা করে ট্যাপ ফিট করা আছে, ট্যাপ খুললেই প্রতিবর্গ ইঞ্চিতে দেড়শো পাউণ্ড প্রেসার থাকা উচ্চ চাপ বায়ু সবেগে বেরিয়ে এসে মুহূর্তের মধ্যে ঘরের সব ধুলো বার করে দিত। ঘর দুয়ার মেঝে আসবাবপত্র সব কিছুই ঝকঝক করতে থাকত। তারপর বিদ্যুৎতরঙ্গে স্নান সমাপন করে শুচি সিদ্ধ প্রসন্নতায় ঝলমল করতে করতে আমার পাশে এসে বসত, তার সমস্ত শরীর থেকে একটা অপূর্ব সুগন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ত।

চেহারাটাই না হয় আলাদা, কিন্তু আসলে নারী-মন তো। পৃথিবীর মেয়েদের মতোই তার কৌতূহলও ছিল দুর্বার। স্বচ্ছন্দে কথাবার্তা বলবার সুন্দর ব্যবস্থাও আছে হাতের কাছে, তাই আমার পাশে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে চলত বিম্বিলিবিলিকিলি। অদেখা পৃথিবীর সম্বন্ধে তার দুর্বার কৌতূহল মেটাতে গিয়ে আমাকে অনেক কথাই বলতে হত। পৃথিবীর ওপরে বিশাল চন্দ্রাতপের মতো সুনীল

আকাশে, সূর্য, চাঁদ আর তারকাপুঞ্জের কথা শুনতে শুনতে তার দু'চোখে যেন আবেশ ঘনাতো, তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তর, শ্যামল অরণ্যানী, প্রস্ফুটিত ফুলের নয়নাভিরাম সৌন্দর্যের কথা শুনতে শুনতে উত্তেজিত হয়ে পড়ত সে। আবার খরস্রোতা নদী, ঝরণা, হ্রদ আর গর্জমান চির বিক্ষুব্ধ মহাসাগরের কথা শুনে শুনে আর তার আশ মিটতো না যেন।

আমার মাঝে মাঝে মনে হত যে, মহাপাতালে যতো সুখ আর স্বাচ্ছন্দ্যের বিধানই থাক না কেন, একমাত্র বৈচিত্র্যের অভাবেই আর প্রাকৃতিক পরিবেশ একেবারেই না থাকবার ফলেই এখানকার প্রাণীদের জীবন ধারায় এসে গেছে একটা যান্ত্রিকতা, যার চাপে এদের মন মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে ওঠে। আমাদের পৃথিবীতে দুঃখ আছে, দৈন্য আছে, আছে অভাব,—খাদ্যের, বস্ত্রের, এমনকী মানবিকতাবোধের। তবু সব মিলিয়ে একটা অখণ্ড সামগানের সুর মনকে ভরিয়ে রাখে আর তাই এই মহাপাতালের আমার বন্ধু অশ্চলবলগল আর তার স্ত্রী আমাকে যত সুখেই রাখুন না কেন, সেই দুঃখজর্জর বহু বিচিত্র পৃথিবীর জন্য আমার মন হু হু করে উঠত।

কিছুদিন পরে এক গোলাপী সন্ধ্যায় আমি, অশ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলি বসবার ঘরে বসে গল্পগাছা করছিলাম। ওরা স্বামী-স্ত্রীকে যে সব কথা বলে তাও আমার কমপিউটার যন্ত্রের ভেতর দিয়ে পরিষ্কার বুঝতে পারি লক্ষ্য করে পরিহাস-তরল অ্যানটেনা কম্পনে অশ্চলবলগল বলল,—"এ তো আচ্ছা মুস্কিলে পড়া গেল দেখছি। তোমার হাতে ওই যন্ত্রটা থাকতে আমাদের স্বামী-স্ত্রীর নিভৃতবাণী বিনিময় করাও চলবে না দেখছি—"

আমি বললাম,—"কেমন জব্দ, আর আনবে পৃথিবীর মানুষকে বন্দী করে?"

অশ্চলবলগল বলল,—"বন্দী! ছি ছি ছি! এ কথা কেন বলছ, মজুমদার? বন্দী তো তুমি নও, তুমি যে আমার বন্ধু—"

ওর কথায় আমি একটু বিচলিত হয়ে বললাম,—"না না, তোমার বন্ধুর সম্বন্ধে লেশমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করছি না আমি, কিন্তু তা হলেও বন্দী ছাড়া আমাকে আর কী বলা যায় বল? হয়তো আমিই একমাত্র মানুষ যে—"

বিম্বিলিবিলিকিলি কমপিউটার যন্ত্রটা তার স্বামীর হাত থেকে নিজের হাতে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল,—"না,না, তুমিই একমাত্র মানুষ নও, আর একজন আছে, তবে তাকে শুধু মানুষ না বলে মেয়েমানুষ বললেই বোধ হয় ব্যাকরণের মান রক্ষা হয়, তাই না?"

আমি চেঁচিয়ে বলে উঠলাম,—"আর একজন মেয়ে? কে সে?"

অশ্চলবলগল বলল,—"আমাদের গত বছরের ভূপৃষ্ঠে অভিযান বাহিনী তাকে নিয়ে এসেছে গত বছর, সে আছে সেই অভিযানের নায়ক পিন্টিনিকোলাবলর কাছে, দেখতে চাও তাকে?" গভীর উত্তেজনায় দাঁড়িয়ে উঠে আমি বললাম,—"নিশ্চয়ই চাই, এক্ষুনি।"

ওরা দু'জনও উঠে দাঁড়াল,বিম্বিলিবিলিকিলি তার টেলিস্কোপিক বহুভাঁজ হাত দিয়ে আমার হাত ধরে মৃদু কম্পনে বলল,—"এস আমার সঙ্গে—"

ওদের দু'জনের সঙ্গে বাড়ির পেছনে একটা ছোট ঘরে গেলাম। দুই-বাই-আট ফুট ঘরখানা ঠিক যেন একটা ছোট্ট প্রেক্ষাগৃহ। এক দিকের দেওয়ালে একটা বাদামী রং-এর পর্দা টাঙানো ছিল। অশ্চলবলগল কী একটা সুইচ টিপতেই পর্দাটা এক দিকে সরে গেল, আমি তার ওপারে একটা অতল গহ্বর দেখতে পেলাম। নিকষ কৃষ্ণ সেই গহ্বরে একটা আলোকবিন্দু দেখতে পেলাম, বিন্দুটা অনেক দূরে সরে যেতে যেতে হঠাৎ এক সময়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখতে পেলাম, অশ্চলবলগলর বাড়ির মতো একটা পিরামিডাকৃতি বাড়ি, সোনালী আলোতে যেন একটা স্বপ্ন-ছবি। মনে হল যেন অস্তসূর্যের শেষ রক্তরশ্মি আকাশের গায়ে বিলীন হয়ে যাবার আগে পরম যত্নে ও পরম মমতায় তার আশ্চর্য রঙের তুলিখানা ওই বাড়িটার গায়ে বুলিয়ে দিয়ে গেছে।

আমি বাহ্যজ্ঞান শূন্য হয়ে সেই সোনালী আলোয় ঝলমল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। দেখতে দেখতে তার দেওয়ালগুলো যেন আস্তে আস্তে কোথায় মিলিয়ে গেল। দেখলাম, মস্ত বড় একটা ঘর আর সেই ঘরে সত্যিই একটি পৃথিবীর মেয়ে চুপ করে গালে হাত দিয়ে আপন মনে বসে বসে যেন ভাবছে।

মেয়েটি বালিকা কি যুবতী, সুন্দরী কি কুরূপা, স্বাস্থ্যবতী কি রুগ্না, সে সব কথা আমার মনেই এল না; এই বিপুল মহাপাতালে আমি যে নিঃসঙ্গ নই, এই ধারণাটা আমার ম্রিয়মান মনে যেন মৃতসঞ্জীবনীর ক্রিয়া করল। আমি সম্মোহিতের মতো বহুদূরবর্তিনী মেয়েটির মুখে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম।

দেখতে দেখতে মেয়েটির ছবি মিলিয়ে গেল, দেখা দিল সেই নিকষ-কৃষ্ণ অন্ধকারের মাঝে একটি আলোকবিন্দু।

অশ্চলবলগল সুইচ অফ করে দিল, সারা ঘর আবার গোলাপী আলোয় ভরে গেল,বাদামী রং-এর পর্দাটা আবার যথাস্থানে ফিরে এল।

আমার অবাক হয়ে চেয়ে থাকা মুখের দিকে তাকিয়ে বিম্বিলিবিলিকিলি তার অ্যানটেনার কম্পনের ভাষায় বলল,—"খুবই অবাক হয়ে গেছ, মজুমদার? এই যন্ত্রটার নাম টেলিভিসোস্কোপ, এর সাহায্যে ঘরে বসে হাজার হাজার মাইল দূরের লোককে দেখা যায়, তার সঙ্গে কথা বলা যায়—"

"কথা বলা যায়?"—আমার কণ্ঠস্বর পরম বিস্ময় ধ্বনিত হয়ে উঠল,—"তার মানে আমি ওই মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

অশ্চলবলগল বলল,—"হ্যাঁ, তা পারো, তবে তার আগে একটা কথা জানা দরকার। আমাদের মহাপাতালে একটি মাত্র ভাষাই চালু আছে, সিম্বিলিকোলাপ্টারা সবাই সেই একই ভাষায় মনের ভাব বিনিময় করে, কিন্তু আমি লক্ষ্য করেছি যে, তোমার আর ওই মেয়েটির কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর তৈরি করবার আগে তোমার এ আশা পূরণ হবার নয়, মজুমদার—"

আমি ব্যগ্র কণ্ঠে বললাম,—"কিন্তু এই যন্ত্রে কিছু পরিবর্তন করা যায় না?"

বিম্বিলিবিলিকিলি রসিকতা করে কম্পন-সঙ্কেতে বলল,—"ওরে বাবা, একবার দেখেই এত! কথা বলতে পারলে না জানি কী দশা হবে তোমার—"

আমি লজ্জারুণ হয়ে বললাম,—"ঠিক তা নয় বিম্বিলিবিলিকিলি, অপ্রত্যাশিতভাবে পৃথিবীর একজন মানুষকে এই মহাপাতালে দেখতে পেয়ে আমার মন আনন্দে নেচে উঠেছে, সে পুরুষ কি নারী, এই প্রশ্ন আমার মনে ওঠেইনি। কিন্তু আমাকে বা ওকে এই মহাপাতালে কী করে নিয়ে এলে তোমরা, এটা আমার কাছে একটা রহস্যই হয়ে আছে,—যদি বাধা না থাকে তো—"

আমার ইঙ্গিত বুঝতে পেরে অশ্চলবলগল বলল,—"না, বাধা তেমন কিছু নেই, কারণ সে তথ্য জানবার পরও তুমি এই মহাপাতালের সীমানা ছাড়িয়ে তোমাদের পৃথিবীতে পালিয়ে যেতে পারবে না, মজুমদার। যাই হোক, বসবার ঘরে চলো, তোমার কৌতূহল মিটিয়ে দিচ্ছি।"

আমরা সবাই বসবার ঘরে এসে বসলাম। আমি জিজ্ঞাসু চোখে অশ্চলবলগলর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

তার পোর্টেবল ইলেকট্রিক-কাম-কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্রের মাধ্যমে অশ্চলবলগল বলতে লাগল :-

"তোমার কাছে শুনেছি যে, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা আজ পৃথিবীর সীমানা ছাড়িয়ে মহাকাশে পাড়ি দেবার আয়োজনটা প্রায় নিখুঁত করে ফেলেছেন। আমরাও এই মহাপাতালের বাইরে যাবার জন্য বেশ কিছুদিন ধরে চেষ্টা করে আসছি। তোমাদের মহাকাশে পাড়ি দেবার কাজের চেয়ে এ কাজটা কঠিন, কারণ তোমাদের শূন্যযানকে শুধু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ও বায়ুর প্রতিরোধ শক্তির বিরুদ্ধে এগিয়ে যেতে হয়, কিন্তু মহাপাতালের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর তুলনায় প্রায় তিন গুণ, তাছাড়া হাজার হাজার মাইল বেধের গ্রানাইট ও অন্যান্য কঠিন ধাতুর আবরণ ভেদ করাটা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার।

"অদৃশ্যরশ্মি ও পারমাণবিক শক্তিচালিত আমাদের বিজ্ঞানশালা আর কলকারখানাগুলি এ নিয়ে দিন রাত অনেক পরীক্ষা করতে করতে পারমাণবিক শক্তিচালিত স্বয়ংক্রিয় এক বিরাট ঘূর্ণ্য-বর্মা তৈরি করল। এই বর্মা এমন এক অ্যালয় দিয়ে তৈরি,যা হীরের চেয়েও হাজার গুণ কঠিন।

"মহাপাতালের এক জনবসতিহীন অঞ্চলে কয়েকশো হলদে আর লাল রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা এই যন্ত্র নিয়ে কাজ শুরু করল। হাজার হাজার মাইল পুরু কঠিনতম শিলা ও অন্যান্য ধাতুর বুক ফুটো করে ওপরের দিকে একটা সুড়ঙ্গ পথ তৈরি করাই ছিল তাদের কাজ। এ কাজে অনেক বছর লেগে গেল, বহু নতুন নতুন সমস্যা দেখা দিল,কিন্তু অখণ্ড অধ্যবসায়ের সামনে যে কোন জটিল সমস্যার সমাধান হতে দেরি হয় না, তাই একদিন মহাপাতাল থেকে তোমাদের ভূপৃষ্ঠে যাবার সরাসরি রাস্তা তৈরি হয়ে গেল।

"প্রথমে পাঠানো হল একটা অনুসন্ধানকারী দল, আমরা আমাদের বিজ্ঞান ভবনের টেলিভিসোস্কোপে তাদের লক্ষ্য করতে লাগলাম। একটা বড় চক্ররথে চেপে একজন হলদে,একজন লাল, একজন নীল আর একজন সবুজ রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা যোগ দিয়েছিল এই অভিযানে। ভূপৃষ্ঠে সুড়ঙ্গের শেষ হয়েছিল চিরন্তন বরফে ঢাকা একটা পাহাড়ি অঞ্চলে। ওখানকার তাপমাত্রা, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, বায়ুর চাপ, বাতাসে অকসিজেনের পরিমাণ প্রভৃতি তথ্য নিয়ে প্রথম অনুসন্ধানকারী দল নির্বিঘ্নে ফিরে এল। এরপর গত বছর পিন্টিনিকোলাবলকে পাঠানো হল ভূপৃষ্ঠের প্রাণীর একটি নমুনা নিয়ে আসবার জন্য। সে নিয়ে এল একটু আগে তোমার দেখা ওই মেয়েটিকে।

আমি বলে উঠলাম,—"মেয়েটি স্বেচ্ছায় এল?"

একটু চুপ করে থেকে অশ্চলবলগল বলল,—"স্বেচ্ছায় কি আর কেউ নিজের দেশ ছেড়ে এই মহাপাতালের শব্দহীন রাজ্যে আসে? অজ্ঞান-রশ্মির প্রয়োগে তাকে জ্ঞানহীন করে চক্ররথে তুলে তাকে এনেছিল পিন্টিনিকোলাবল, ঠিক যেমনি ভাবে আমি তোমাকে নিয়ে এসেছি।"

"অজ্ঞান-রশ্মি? তার মানে?"

অশ্চলবলগল বলল,—"এ ক'দিনে তোমাকে আমাদের বিজ্ঞান প্রতিভার কল্যাণী মূর্তিই দেখানো হয়েছে, মজুমদার। তুমি দেখনি আমাদের বিধ্বংসী মারণ যন্ত্রগুলি। অজ্ঞান-রশ্মি তারই একটা নিরীহ সংস্করণ মাত্র। যন্ত্র থেকে এই রশ্মি দু'শ মাইল দূরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে বৃত্তাকারে, এর সীমানার ভেতরে যত প্রাণী থাকবে সবাই মুহূর্তের মধ্যে অজ্ঞান হয়ে পড়বে,—অন্যগুলোর কথা শুনতে চেও না, ভয় পাবে, ভয়ঙ্কর সে সব অস্ত্র—"

আমি বললাম—"সে কি? জ্ঞান-বিজ্ঞানে এত উন্নত হয়েও আর এমন বুদ্ধিমান প্রাণী হয়েও তোমরা এই মরণ খেলায় মেতে উঠেছ কেন? এই অকল্যাণকে তোমাদের দেশ থেকে চির নির্বাসিত করতে বাধা কি, অশ্চলবলগল?"

অশ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলি পরস্পরের মুখে তাকালো, চুপ করে কী যেন ভাবলো, তারপর দ্বিধা কাটিয়ে অশ্চলবলগল বলল,—"আমরাই মহাপাতালের একচ্ছত্র অধীশ্বর নই, মহাপাতালের অপর প্রান্তে আছে গিণ্ডিয়াগোনাগুপ্পা—"

আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম,—"গিণ্ডিয়াগোনাগুপ্পা? কী বলছ তুমি?"

"হ্যাঁ, ঠিকই বলছি আমি। সেই প্রবল তুষার যুগে আমাদের পূর্বপুরুষ অতিকায় পিপীলিকার সঙ্গে অতিকায় উইপোকাও চলে এসেছিল মহাপাতালে আশ্রয় নিতে। সেই উইপোকা থেকে বহু বিবর্তনের পর বর্তমান সুসভ্য গিণ্ডিয়াগোনাগুপ্পা জাতির উদ্ভব হয়েছে। ওরা অবশ্য থাকে আরও গভীরে, ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় তিন হাজার মাইল নিচে চলে গেছে। ওরাও জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রায় আমাদের সমকক্ষ, তবে আমরা যেমন পারমাণবিক ঘূর্ণ্য বর্মার সাহায্যে হাজার মাইল পাথর কেটে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ভূপৃষ্ঠ বিহার করে এসেছি,ওরা এখনও তা পারেনি। তবে ওদের দেশের বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে প্রচুর এক্স্পেরিমেন্ট করছে, মনে হয় শিগ্গিরই হয়তো সফল হবে,—অন্তত আমাদের গুপ্তচর বিভাগের রিপোর্ট থেকে তাই অনুমান করা যায়।"

"গুপ্তচর! তবে কি ওদের সঙ্গে তোমাদের সদ্ভাব নেই?"

আমার কথা শুনে হঠাৎ ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে অশ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলি। অশ্চলবলগলর ভাঁটার মতো চোখ দুটো ঘুরতে থাকে, কমপিউটার মেশিনের ভেতর দিয়ে ওর গলার আওয়াজ গাঁক গাঁক করে ওঠে,—"সদ্ভাব! ওরা আমাদের চিরশত্রু, শুধু আজ নয়, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশের প্রথম যুগ থেকে পরস্পরের সঙ্গে অসংখ্য বিধ্বংসী যুদ্ধ হয়ে গেছে আমাদের,—ওরা আমাদের চিরশত্রু—"

আমি বললাম,—"কী আশ্চর্য! বিজ্ঞানে এমন অভাবনীয় উন্নতি করেও তোমরা পরস্পরের প্রতি শত্রুতা ভুলতে মিলন সেতু রচনা করতে পারছ না?"

দীপ্ত মুখে অশ্চলবলগল বলল,—"না, না,—এই মহাপাতালে দুই শ্রেণীর প্রাণীর স্থান নেই, হয় ওরা টিকে থাকবে, নয়তো আমরা। এবার যে যুদ্ধ হবে সেই হবে আমাদের শেষ যুদ্ধ, এতেই থাকবার অধিকারের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে যাবে, মজুমদার। তোমাকে চুপি চুপি বলি, আসন্ন মহাযুদ্ধের জন্য আমরা বিশেষ মারাত্মক এক রশ্মি আবিষ্কার করেছি, তার নাম মৃত্যু-রশ্মি। ফোটন চালিতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র থেকে এই মৃত্যু-রশ্মি চোখের পলক পড়বার আগেই হাজার মাইল দূরের লক্ষ্য বস্তুতে আঘাত হানবে, প্রাণী দেহগুলি মৌলিক উপাদানে বিশ্লিষ্ট হয়ে পড়বে, তার চিহ্ন মাত্রও খুঁজে পাওয়া যাবে না, আর এ এমনই এক অদ্ভুত রশ্মি যে একে কোনো কিছু দিয়েই প্রতিহত করা যায় না—"

আমি রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলাম,—"আর ওরা,—গিণ্ডিয়াগোনাগুাপ্পারা,—ওরা কি এ ধরনের কিছু আবিষ্কার করেনি?"

একটা ছায়া ভেসে গেল অশ্চলবলগলর মুখের ওপর দিয়ে, দ্বিধাগ্রস্ত সুরে বলল,—"হ্যাঁ, তা—মানে, আমাদের গুপ্তচর বিভাগ অবশ্য জানিয়েছে যে ওরাও এক ধরনের রশ্মি আবিষ্কার করেছে যার প্রয়োগে মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়, বুদ্ধিবৃত্তি ধ্বংস হয়ে যাবার ফলে সেই প্রাণী তখন তার আদিম পূর্বপুরুষের মতোই নির্বোধ হয়ে যাবে—"

আমি শিউরে উঠে বললাম,—"কী সর্বনাশ! বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই কি পরিণাম?"

আমার কথায় কান না দিয়ে অশ্চলবলগল বলে চলল,—"অবশ্য আমরাও বসে নেই, ওই রশ্মির প্রতিরোধক সুট তৈরি করবার কাজে আমাদের বিজ্ঞানাগার আর কারখানাগুলোতে অবিরাম কাজ হচ্ছে, আশা করা যায় যে যুদ্ধ আরম্ভ হবার আগেই আমরা প্রস্তুত হয়ে যাবো।"

ওর কথা শুনে আমি কিছুক্ষণ বিমূঢ়ের মতো চুপ করে রইলাম, তারপর অশ্চলবলগলর হাত দুটো চেপে ধরে প্রগাঢ় কণ্ঠে বললাম,—"আমি তোমাদের কেউ নই, পরদেশী বন্ধু মাত্র,—আমি গিণ্ডিয়াগোনাগুাপ্পাদেরও কেউ নই,—এমন কি আমি তাদের চোখেও দেখিনি, আমি ভূপৃষ্ঠের শান্তিবাদী মহান দেশ ভারতের একজন সাধারণ মানুষ মাত্র, তবু তোমাকে মিনতি করে বলছি,—এ সর্বনাশ পথ তোমরা ছেড়ে দাও, এতে দুই জাতিরই ঘোর অকল্যাণ হবে, সুসভ্য অতি উন্নত জাতি হিসেবে তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে। শিক্ষায়, দীক্ষায়, বিজ্ঞানচর্চায় তোমরা আর ওরা যে অভূতপূর্ব উন্নতি করেছ এমনভাবে স্বেচ্ছায় তার ধ্বংস তোমরা ডেকে এনো না। মিলেমিশে একত্রে কাজ করলে এর চেয়েও অনেক চমকপ্রদ অত্যাশ্চর্য কল্যাণকর আবিষ্কারের গৌরব পাবে তোমরা, এমন কি ভূপৃষ্ঠে গিয়ে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার আদান-প্রদান করতে পারবে। ভূপৃষ্ঠ ও মহাপাতালের সুসভ্য জাতিপুঞ্জের সমন্বয়ে আমরা গড়ে তুলব এক মহাপৃথিবী, যেখানে থাকবে না দুঃখ-দৈন্য-দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া, থাকবে না পারমাণবিক যুদ্ধের মহা আতঙ্ক, মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে থাকবে শুধু সখ্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির অচ্ছেদ্য বন্ধন। আমরা মহাকাশে পাড়ি দেব, নক্ষত্র থেকে নক্ষত্রান্তরে হানা দেব, মহাপাতালের অনেক অনেক নিচে,—পৃথিবীর কেন্দ্রবিন্দুতে পৌঁছে তার রহস্য উদ্‌ঘাটন করব, আমরা—"

আমার আবেগ দৃপ্ত ভাষণে বাধা পড়ল, বিম্বিলিবিলিকিলি এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে ফেলল, বলল,—"তোমার এই মহৎ চিন্তার আমি প্রশংসা করি, মজুমদার। কিন্তু তোমার বা আমার কথায় কিছু এসে যায় কি? জাতির ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে মহাকেন্দ্রে। মহাকেন্দ্রের মহানিয়ামকদের নির্দেশ অমোঘ, বির্বিচারে তাঁদের আদেশ পালন করাই প্রত্যেক সিম্বিলিকোলাপ্টার পবিত্র কর্তব্য। কাজেই এ সব নিয়ে চিন্তা করা বা আলোচনা করা শুধু নিরর্থকই নয়, দেশদ্রোহিতাও বটে, মহাকেন্দ্রে এমন সব ব্যবস্থা আছে যাতে মহানিয়ামকরা কোনো বিশেষ সুইচ টিপলেই টেলিভিসোস্কোপের স্ক্রিনে আমরা কে কোথায় আছি, কি করছি, কি বলছি সব কিছুই জানতে পারেন, তাঁদের চোখ বা কানকে ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই—"

আমি বললাম,—"এ আবার কেমন কথা? তা হলে কি এ দেশে ব্যক্তিগত গোপনীয়তার কোনো স্থান নেই—"

"না। বিজ্ঞানের অসম্ভব উন্নতির ফলে এ দেশে কোনো কিছুই রেখে ঢেকে রাখবার উপায় নেই, বিজ্ঞানের অদৃশ্য চক্ষু সবাইকে সর্বত্র অনুসরণ করে চলেছে—"

বিম্বিলিবিলিকিলির কথা শুনে আমি ভীষণ অস্বস্তি অনুভব করতে লাগলাম। কারণ জীবনে কোথাও কোনো গোপনীয়তা নেই, সবই সবার কাছে দিব্যালোকের মতো পরিষ্কার, এ অনুভূতিটা আমার মনে একটা জ্বালা ধরিয়ে দিল।

আমার ভাব-ভঙ্গী লক্ষ্য করে অশ্চলবলগল স্নিগ্ধ স্বরে বলল,—"অত মুষড়ে পড়বার মতো কিছু নয়, মজুমদার। ওটা হল চরম ব্যবস্থা, তা না হলে সবাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করে থাকে এ দেশেও—"

আমি বললাম,—"আচ্ছা, একটু আগে যে মহাকেন্দ্র, মহানিয়ামকের কথা বললে, তাঁরাই কি তোমাদের সরকারের প্রধান?"

অশ্চলবলগল বলল,—"হ্যাঁ—"

আমি বললাম—"সরকার আছে অথচ সরকারী কর্মচারীদের কাউকে তো দেখলাম না আজও, তোমাদের শাসনশৃঙ্খলা বজায় থাকে কীভাবে?"

অশ্চলবলগল বলে উঠল,—"দেখ মজুমদার, জাতি হিসেবে আমরা স্বভাবতই শৃঙ্খলাপরায়ণ। আমাদের দেশে খাদ্য সমস্যা না থাকায় জাতীয় জীবনের প্রধানতম সমস্যার কোনো অস্তিত্বই নেই। চুরি, জুয়াচুরি, খুন, ডাকাতি প্রভৃতি যে সব ঘৃণ্য অপরাধ তোমাদের পৃথিবীতে আজও অব্যাহত আছে, তার মূলে আছে খাদ্য সমস্যা। কাজেই এদেশে অপরাধী কেউ নেই, পুলিশবাহিনীরও দরকার নেই, খাদ্যের প্রয়োজনেই অর্থনীতি, বাণিজ্য, কৃষি,—এখানে সে সবেরও কোনো বালাই নেই, কাজেই সবাই চিন্তাশূন্য নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চায় মেতে আছে—"

আমি চমৎকৃত হয়ে বললাম,—"আচ্ছা, কলকারখানা বা বিজ্ঞানশালার কাজে ফাঁকি দেয় না কেউ?"

"একেবারে দেয় না বললে মিথ্যা বলা হবে, তবে সে বোধ হয় হাজারে একজন, এটাকে এদেশে ক্লান্তিরোগ বলে। এরকমের

লোকের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে, আর যে চিকিৎসায় ফলও হয় খুব—"

আমি বললাম,—"আচ্ছা, তোমাদের দেশে সব শুদ্ধু পাঁচ রকম শ্রেণী দেখলাম, কেউ হলদে, কেউ নীল, কেউ সবুজ আবার কেউ বেগুনী রোম—"

বিম্বিলিবিলিকিলি বলে উঠলো,—"আর সাদা? সামনে বসে আছি তবু বুঝি মনে পড়ে না তোমার?"

আমি একটু অপ্রতিভ হয়ে বললাম,—"আহা, তুমি তো মেয়ে, পুরুষদের কথাই বলছি বিম্বিলিবিলিকিলি—"

অশ্চলবলগল বলল,—"তা হলে তোমাকে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার কথাটা খুলে বলতে হয়, মজুমদার। কিন্তু বেশ রাত হয়ে গেছে, তোমার ঘুম পাচ্ছে না তো?"

আমি রেগে বললাম,—"আমি কি শিশু, যে খালি খালি ঘুম পাবে? ও, ভাল কথা এ পর্যন্ত একটি শিশুও তো চোখে পড়ল না তোমাদের দেশে—"

গম্ভীর ভাবে অশ্চলবলগল বলল,—"এ দেশে শিশু নেই—"

"সে কি!"

"হ্যাঁ,—আমরা যে দ্বিজ তা জানো না?"

"দ্বিজ? মানে ব্রাহ্মণ?"

"না, ব্রাহ্মণ নয়, দ্বিজ, দু'বার জন্ম যার—"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমরা ডিম থেকে জন্মেছি—"

"ডিম থেকে।"

"হ্যাঁ, পৃথিবীর পিঁপড়ের ডিম হয় না? আমাদেরও তাই হয়—"

"তা না হয় হল, কিন্তু শিশু থাকবে না কেন?"

"তার কারণ পৃথিবীর পিঁপড়ের সঙ্গে আমাদের লক্ষ লক্ষ বছরের বিবর্তনের তফাৎ। আমাদের দেশের মেয়েরা ডিম প্রসব করবার সময় হলে যৌথ প্রসূতি আগারে চলে যায়। প্রসবান্তে তারা ডিম রেখে চলে আসে। সেখানে জেনেটিকস বিশেষজ্ঞরা ডিমগুলোকে আলোক-খাদ্যের সাহায্যে পরিপুষ্ট করে তুলতে থাকে। একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর থেকে বিশেষ বিশেষ আলোক তরঙ্গের সাহায্যে ডিমের ভেতরে থাকা সিম্বিলিকোলাপ্টা শিশুকে জ্ঞান-বিজ্ঞানে নানা শিক্ষা দিয়ে পারদর্শী করে তোলা হয়। এইভাবে কুড়ি বছর কেটে গেলে অটো ভাইব্রেটিং যন্ত্রের কম্পনে ডিমের খোলা ভেঙে ফেলা হয়, বেরিয়ে আসে একজন নব যুবক সিম্বিলিকোলাপ্টা। তাই আমাদের দেশে বৈতনিক বা অবৈতনিক স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো বালাই নেই। কোর্ট-কাছারি, উকিল-ব্যারিস্টার-মোক্তারের দরকার হয় না। এদেশে থাকা-খাওয়া সব বিনামূল্যে বলে টাকা জমাবার প্রবৃত্তি নেই কারুর, ইনকাম ট্যাকসের বা স্বল্প সঞ্চয়ের কোনো দরকারই হয় না। মোটের ওপর তোমাদের পৃথিবীর সমাজ জীবন যে সব কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে আছে, আমাদের মহাপাতালের সমাজ জীবনে তার চিহ্ন মাত্র খুঁজে পাবে না তুমি—"

অশ্চলবলগলর কথা শুনে আমি তাজ্জব বনে গেলাম। তা হলে তো ওদের মহাকেন্দ্র মহানিয়ামকদের ভেতর পুলিশমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী, বাণিজ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, বনমন্ত্রী, কৃষিমন্ত্রী-টন্ত্রী কিছুই নেই, থাকার মধ্যে আছে হয়তো প্রতিরক্ষা নিয়ামক, বিজ্ঞান নিয়ামক আর স্বরাষ্ট্র নিয়ামক—

আগের কথার সূত্র ধরেই অশ্চলবলগল বলে চললো,—"আমরা বিজ্ঞানে অভূতপূর্ব উন্নতি করলেও প্রকৃতির প্রভাব থেকে একেবারে মুক্ত হতে পারিনি, মজুমদার। তাই প্রত্যেকটি সিম্বিলিকোলাপ্টা যুবকের ব্রেন ম্যাটার সমান হয়নি এখনো। তবে প্রত্যেকের পরিমাণ অনেক কমে এসেছে, হয়তো আরও হাজার বছর পরে প্রত্যেকটি সিম্বিলিকোলাপ্টারই সমান বুদ্ধিবৃত্তি থাকবে। বর্তমানে ব্রেন ম্যাটারের পরিমাণ অনুসারে সিম্বিলিকোলাপ্টারা চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত। হলদে, নীল, আর সবুজ রোম—রংগুলো অবশ্য প্রকৃতিদত্ত নয়, আমাদের ল্যাবরেটরীতে ব্রেন টেস্ট করবার পর বিজ্ঞান মহানিয়ামকের দেওয়া—"

"আর বেগুনী?"

"বেগুনী রং হয় নিয়ামকদের। সবুজ রোম সিম্বিলিকোলাপ্টারা যখন চল্লিশে পা দেয় তখন তাদের আর একবার মস্তিষ্ক পরীক্ষা হয়। পরীক্ষার ফল অনুসারে যে ক'জন নিয়ামক নেওয়া দরকার তাদের নির্বাচিত করা হয়। এই নিয়ামকরাই প্রত্যেকটি বিজ্ঞানশালা ও কারখানার প্রধান। মহানিয়ামক আছে পাঁচজন, নিয়ামকদের ভেতর থেকেই ব্রেন ম্যাটার পরীক্ষা করে তাঁদের নির্বাচিত করা হয়। তা হলেই বুঝতে পারছ যে এদেশের শ্রেষ্ঠ মস্তিষ্কই শুধু দেশের সর্বময় কর্তা হতে পারেন, অযোগ্য লোক শাসন ব্যবস্থায় আসতেই পারে না। এ ব্যবস্থা তোমাদের পৃথিবীর ভোট নামে ভণ্ডামীর চেয়ে অনেক ভাল,—কী বল মজুমদার?"

আমার মুখের ওপর সকৌতুক দৃষ্টিপাত করল অশ্চলবলগল।

কথাটা এতই সত্যি যে সহসা আমার মুখ দিয়ে কোনো কথা বের হল না।

একটু পরে বললাম, "আর মেয়েদের বুঝি শুধুই সাদা রোম?"

"হ্যাঁ, এ দেশের মেয়েদের জীবন শিল্পসাধনায় উৎসর্গীকৃত, তাঁরা—"

অশ্চলবলগলর কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলে ওঠে বিম্বিলিবিলিকিলি,—"থামো তুমি,—মেয়েদের কথা আমাকেই বলতে দাও,— ডিম অবস্থায় প্রথম দশ বছর একই সঙ্গে সাধারণ শিক্ষা পায় ছেলে ও মেয়েরা। তারপর যান্ত্রিক পরীক্ষায় ছেলে ও মেয়েদের আলাদা করে রাখা হয়, তখন ছেলেদের শেখানো হয় এঞ্জিনীয়ারিং কারিগরী বিজ্ঞান প্রসঙ্গ, তার মানে ডিম ফুটে বের হবার আগেই একটি ছেলে ওই সব বিষয়ে একেবারে আপ-টু-ডেট জ্ঞান পেয়ে যায়, খোলসের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবার পর তারা শুধু গবেষণার কাজে লেগে যায়। আলাদা করে নেবার পর মেয়েদের সাহিত্য ও সুকুমার শিল্প বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হয়। বহু যুগ যুগান্তর থেকে

একই বিষয় চর্চা করে আসবার ফলে কি ছেলেরা কি মেয়েরা সবাই বংশগতির সূত্র অনুসারে বিজ্ঞান বা সুকুমার শিল্পকলা সম্বন্ধে একটা স্বাভাবিক প্রবণতা পেয়ে থাকে। তাই নিজ নিজ ক্ষেত্রে সবাই প্রতিভার পরিচয় দিতে পারে—"

আমি বললাম,—"সে কি। ছেলেমেয়েদের কি শিক্ষার বিষয় নির্বাচন করবার কোনো স্বাধীনতাই নেই এদেশে?"

দৃঢ় স্বরে বিম্বিলিবিলিকিলি বলল,—"না তা নেই, কারণ তার কোনো প্রয়োজনই নেই, কারণ যান্ত্রিক উপায়ে কে কোন্ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করবে তা আগে থেকেই নির্ভুলভাবে নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজেই বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। এই আমার কথাই ধরো না কেন,—আমি যে সাহিত্যিক হব, সাহিত্যের প্রতি আমার বিশেষ প্রবণতা আছে, তা আমি খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসবার বহু আগেই জানা গেছিল। ডিমে থাকা অবস্থাতেই আমি প্রাচীন সিম্বিলিকোলা সাহিত্যের সব ক'টি শাখা সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য সব জেনে গেছিলাম। যখন খোলস ভেঙে বেরিয়ে এলাম, তখন আমি কুড়ি বছরের তরুণী, চোখে আমার মহৎ সাহিত্য সৃষ্টির স্বপ্ন, মস্তিষ্কে ভরা সাহিত্য বিষয়ে যাবতীয় তথ্য ও সত্য। ছ'মাস আমাকে পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রে রাখা হল, সেখানে থাকার সময়ে বিশেষজ্ঞরা লক্ষ্য করলেন যে, সাহিত্যের কবিতা শাখাতেই আমি অসাধারণ নৈপুণ্য প্রকাশ করতে পারব, আর হয়েছেও ঠিক তাই—"

আর চুপ করে থাকতে না পেরে অশ্চলবলগল বলে উঠলো,—"গত বছর বিম্বিলিবিলিকিলিকে মহানিয়ামক কেন্দ্রের শিল্প বিভাগ থেকে—'কাব্যরাণী' মহান সম্মান দেওয়া হয়েছে তার 'অন্ধকারের রোদ' কাব্যগ্রন্থের জন্য,—আর এটাই হচ্ছে কবিতার ক্ষেত্রে শিল্প বিভাগের শ্রেষ্ঠ সম্মান—"

"আর তুমিও যে 'বিজ্ঞান-রাজ' সম্মান পেয়েছ তা বললে না?—" কলকলিয়ে বলে ওঠে বিম্বিলিবিলিকিলি, ওদের দু'জনের চোখ থেকে গভীর প্রেমের স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকে। দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম আমি। বেশ আছে ওরা দু'জনে।

আমি বললাম,—"তোমাদের এই প্রসূতি আগারটা খুব দেখতে ইচ্ছে করছে, অশ্চলবলগল। ডিমের ভেতরে থাকা অবস্থায় আলোক-খাদ্য খেয়ে বড় হয়ে ওঠাটা না হয় বুঝতে পারি কিন্তু ও অবস্থায় শিক্ষাদান কি করে সম্ভব সেটা আমার মাথায় ঢুকছে না। অবশ্য এ ধরনের একটা ইঙ্গিত আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস মহাভারতে আছে। বাবা-মার কথা শুনে শুনে সুভদ্রার গর্ভে থাকা অবস্থাতেই যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করেছিল অর্জুন-পুত্র অভিমন্যু, এমনকি চক্রব্যূহে ঢোকবার মতো একটা ভীষণ জটিল কঠিন রণনীতিও শিখে ফেলেছিল, আর তাই মাত্র ষোলো বছর বয়সেই সে কৌরব-ত্রাণ হতে পেরেছিল—"

"তবেই দেখ, মজুমদার,—ব্যাপারটাকে যতটা অবাস্তব ভাবছ তা মোটেই নয়—"

"তা ছাড়া বার্ণাড শ' নামে পৃথিবীর একজন খ্যাতনামা নাট্যকারের একটি নাটকেও এ ধরনের কিছু বক্তব্য আছে,—যাই হোক যদি বাধা না থাকে,—প্রসূতি আগার দেখাবার ব্যবস্থা করা যায় কি?"

একটু ভেবে অশ্চলবলগল বলল,—"মহানিয়ামক কেন্দ্র থেকে অনুমতি নিতে হবে, দেখি কি করা যায়—"

পাঁচ

(রূপসী নীনা)

পরদিন সকালে এক দফা আলোক-খাদ্য খেয়ে অশ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলি যে যার কাজে বেরিয়ে গেল। আলোক-খাদ্য খেয়ে খেয়ে এখন আমি বেশ অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, তাই বুঝতে পেরেছি যে, দিনে রাতে বিভিন্ন সময়ে যে আলোক-খাদ্য পরিবেশন করা হয় তার স্বাদ সব আলাদা আলাদা। এই সকালবেলা আমরা যে আলোক-খাদ্য খেলাম তার স্বাদ অনেকটা কফি, টোস্ট, ডিমের পোচ আর এক কাপ খাঁটি দুধের সম্মিলিত স্বাদের মতো। দুপুরের আলোক খাদ্যে থাকে কার্বোহাইড্রেট, ফ্যাট, প্রোটিন, স্টার্চ আর খনিজ জলের স্বাদ, রাত্রেও তাই। ভিটামিন থাকে প্রচুর পরিমাণে। এই অতি সুষম খাঁটি খাবার খায় বলেই দেশের সবাই নীরোগ আর স্বাস্থ্যবান। সংক্রামক ব্যাধি এদের দেশে নেই, কারণ বহুদিন আগেই তীব্র অতিবেগুনী রশ্মির সাহায্যে রোগ-বীজাণুগুলো সব ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে। আমাকে পৃথিবী থেকে নিয়ে আসার পর ওদের কোয়ারেন্টাইন গৃহে আমাকে আর অশ্চলবলগলকে তীব্র অতিবেগুনী রশ্মি ধারায় স্নান করতে হয়েছে। তখন আমি অজ্ঞান-রশ্মির প্রভাবে জ্ঞানহারা ছিলাম বলে এ ব্যাপারটা জানতে পারিনি। অশ্চলবলগলর কাছে শুনেছিলাম কিছুদিন পরে।

উদ্দেশ্যবিহীনভাবে এ-ঘর ও-ঘর করতে করতে আমি অশ্চলবলগলর ছোট্ট ল্যাবরেটরীতে ঢুকলাম। টেলিভিসোস্কোপের পর্দার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই গত সন্ধ্যায় অচেনা মেয়েটি কথা মনে পড়ল আমার। অকস্মাৎ আমার সমস্ত হৃদয় তার সঙ্গ-লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। শত দোষ-ত্রুটি ভরা হলেও পৃথিবীর মানুষ যে আমার কত প্রিয় তার পরিচয় পেয়ে আমার চোখে জল এসে গেল।

এই মহাপাতালের সিম্বিলিকোলাপ্টারা আমাকে পরম সুখে অতি সমাদরে রেখেছে, রাজকীয় অতিথির মর্যাদা দিয়েছে,সব রকমের আনন্দবিধানের ব্যবস্থা করেছে, তবু এই পাতালপুরীর মহাস্তব্ধতার ভয়াবহ পাষাণভার যেন অনুক্ষণ আমার বুকে চেপে বসে আছে। এখানে প্রকৃতির শ্যামশোভা নেই, অল্প হাওয়ায় দুলতে থাকা বৃক্ষশালার মৃদু মর্মর নেই, পাখির আনন্দ কাকলী নেই। সূর্য ওঠা ভোরে মাটির বুকে, গাছের পাতায়, চিরহরিৎ শস্যক্ষেত্রে রোদের আলিঙ্গন নেই, নেই পশ্চিম আকাশ পটে অস্ত-সূর্যের আলোক তুলিকায় আঁকা বহু বিচিত্র বর্ণাঢ্য ছবি। এখানে শুধু যন্ত্র আর যন্ত্র আর যন্ত্র। মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা, হাঁটা-চলা, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহ—সব নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে একমাত্র যন্ত্রের শক্তিতে। কোন অলক্ষ্যে যেন মাটির পৃথিবীর জন্য মনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে পুঞ্জিত হচ্ছিল, আজ এক মুহূর্তে আত্মপ্রকাশ করে আমাকে দিশেহারা করে ফেলল। মনে মনে সঙ্কল্প করলাম, যে করেই হোক পরগৃহবাসিনী পৃথিবীর এই মেয়েটির কাছে আমাকে যেতেই হবে, তার সঙ্গে কথা বলতেই হবে। কিন্তু কি করে?

বিষণ্নতার ভারে মনটা ভারি হয়ে উঠল, আমি আস্তে আস্তে অশ্চলবলগলর বসবার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম। ডি-গ্র্যাভিটি ধাতুর জুতো পরার পর থেকে মহাপাতালের তিন গুণ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আমাকে আর কাবু করতে পারে না, বরং শরীরটা আরও লঘু, আরও হাল্কা বলে মনে হল।

বসবার ঘরে আমার জন্য এক বিপুল বিস্ময় অপেক্ষা করেছিল। দরজার কাছে আমার দিকে পেছন ফিরে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল একজন ঘন নীল রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা।

আমার গায়ের গন্ধ থেকেই হোক বা অন্য যে কোনো উপায়েই হোক—আমার উপস্থিতি টের পেল সে। চার পা এগিয়ে এসে তার অ্যানটেনা কাঁপিয়ে কী যেন বলল। আমি প্যান্টের পকেট থেকে ইলেকট্রনিক কমপিউটার-কাম-ট্র্যান্সলেটর বের করে কানে লাগালাম। লক্ষ্য করলাম যে, ওর কানেও একটা অনুরূপ যন্ত্র লাগানো আছে।

আগন্তুক বলল,—"আমার নাম কম্যাণ্ডার পিন্টিনিকোলাবল—"

আমার মস্তিষ্কের স্মরণ কেন্দ্রে একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন উঠল, নামটা যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল, আমি চেঁচিয়ে উঠলাম,—"ও, আপনিই তো প্রথম ভূপৃষ্ঠ যাত্রী,—তাই না?"

পিন্টিনিকোলাবল বিনয়ে মাথা অনবত করে বলল,—"ঠিক বলেছেন, কিন্তু এ কথা আপনি জানলেন কি করে?"

"অশ্চলবলগলর কাছে শুনেছি—"

একজন উপমন্ত্রীর কাছে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর নাম করলে তাঁর মুখের যে অবস্থা হয়, এর কাছে অশ্চলবলগলর নাম করে দেখলাম ঠিক তেমনটিই হল। সে সম্ভ্রমের সুরে বলল, "সবুজরোম অশ্চলবলগলর বন্ধু, আমার শ্রদ্ধা গ্রহণ করুন—"

তার এই হঠাৎ ভক্তিতে অবাক হয়ে আমি বললাম,—"দাঁড়িয়ে রইলেন কেন, বসুন—"

যেন পরম আপ্যায়িত হয়ে পিন্টিনিকোলাবল একটা গভীর-গদি রকিং চেয়ারে বসল, আমি জিজ্ঞাসু চোখে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

একটু ইতস্তত করে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"অবশ্য সবুজ রোম অশ্চলবলগলর অজ্ঞাতে এভাবে আপনার সঙ্গে দেখা করাটা ঠিক শিষ্টাচার সঙ্গত হচ্ছে না, কিন্তু..." বলতে বলতে থেমে গেল সে। আমার মনে হল যেন তার মুখটা পলকের জন্য রাঙা হয়ে উঠল।

হঠাৎ একটু সামনে ঝুঁকে ওর বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাতটা লম্বা করে, আমার হাত দুটো চেপে ধরল পিন্টিনিকোলাবল গভীর অনুনয়ের স্বরে বলল,—"তবু নিতান্ত প্রাণের দায়েই আমি এ ঝুঁকিটা নিয়েছি, অরবিন্দ। আপনি কথা দিন যে, আমাকে সাহায্য করবেন, বলুন—বলুন,—কথা দিন ..."

আমি আশ্চর্য হয়ে বললাম,—"আপনি আমার নাম জানলেন কি করে?"

"সবুজ রোম অশ্চলবলগলর অভিযানের ছবি আমরা টেলিভিসোস্কোপে দেখেছি যে,—কিন্তু সে কথা পরে হবে, আপনার সাহায্য ছাড়া আমি প্রাণে বাঁচব না, অরবিন্দ—"

আমি ওর ভাবভঙ্গী দেখে বুঝলাম যে, সে ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করছে না, সত্যি সত্যিই কোনো একটা ব্যাপারে আমার সাহায্য চায়। কিন্তু এই বিচিত্র দেশে আমি তাকে কী সাহায্য করতে পারি তা ভেবে পেলাম না। একটু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম,—"কিন্তু আমি নিজেই তো আপনাদের দেশে বন্দী, আমি কিভাবে আপনাকে সাহায্য করতে পারি বলুন?"

মাথা নেড়ে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"তা হোক, তবু এই মহাপাতালে একমাত্র আপনিই পারেন আমার উপকার করতে, আমাকে প্রাণে বাঁচাতে—"

"কথাটা একটু খুলে বলুন, সবই যে হেঁয়ালীর মতো শোনাচ্ছে—আমি—"

আমার কথায় বাধা দিয়ে পিন্টিনিকোলাবল বলে ওঠে,—"হেঁয়ালী নয়, হেঁয়ালী নয়, অরবিন্দ। এ আমার জীবন-মরণ সমস্যা, সব খুলে বললেই বুঝতে পারবেন যে—"

"আমিও তো তাই বলছি, সব কথা খুলে বলুন, শুনি—"

কথা বলতে গিয়ে একটু ইতস্তত করতে লাগল পিন্টিনিকোলাবল, তার অ্যানটেনা দু'টোর ভেতর ঘন ঘন স্পার্কিং হতে লাগল, বুঝলাম যে, এটা তার গভীর উত্তেজনার নিদর্শন। একটু পরে কাঁপা গলায় সে বলল,—"আপনাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি তো অরবিন্দ—"

"নিশ্চয়ই—"

"এ সব কথা কাউকে বলবেন না, অশ্চলবলগল বা তার বিদুষী স্ত্রী বিম্বিলিবিলিকিলিকেও না?"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, কাউকে কোনো কথা বলব না আমি—"

আমার আশ্বাসবাণীর পর লজ্জায় রাঙা হয়ে, ফিসফিস করে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"আমি প্রেমে পড়েছি, অরবিন্দ—"

ওর কথা শুনে আমি হাসব না কাঁদব ভেবে পেলাম না। এই ওর অতিশয় গোপন কথা। এর জন্যই এত ভনিতা, এত বাগাড়ম্বর।

কিন্তু ওর পরের কথাগুলো শোনার পর আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে গেল। পিন্টিনিকোলাবল বলে চলল, "হ্যাঁ, আমি প্রেমে পড়েছি, সেটা কোনো আশ্চর্য বা অস্বাভাবিক কথা নয়, কিন্তু আমি কোনো সিম্বিসিকোলাপ্টা রূপসীকে ভালবাসিনি, ভালবেসেছি একজন মর্ত্য রূপসীকে—"

আমার মুখ দিয়ে একটা বিস্ময়সূচক অব্যয় বেরিয়ে এল,—"সে কি!"

"হ্যাঁ, তোমাদের পৃথিবীর মেয়ে সে, নাম তার নীনা, ওকে আমি পাগলের মতো ভালবেসেছি, তাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে, অরবিন্দ।"

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হল না। এও কি সম্ভব! চেহারায়, চরিত্রে, আচারে, আচরণে সম্পূর্ণ আলাদা একটি পৃথিবীর মেয়েকে কি করে ভালবাসল পিন্টিনিকোলাবল!

আমার মুখের বিমূঢ় ভাব দেখতে পেল পিন্টিনিকোলাবল। বলল,—"সব কথা খুলে বললে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে আপনার কাছে। আপনি তো জানেন যে, আমিই প্রথম ভূপৃষ্ঠ অভিযানকারী। এই রোমাঞ্চকর অভিযানের নায়ক নির্বাচিত হয়ে অবধি আমার

মনে আনন্দের আর সীমা ছিল না। আমাদের চক্ররথগুলো মহাপাতালের ভারী বায়ুস্তর ও তীব্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির পরিবেশেই অভ্যস্ত, হাজার মাইল ওপরে ওঠার মতো শক্তি তাদের নেই। কিন্তু আমাদের বিজ্ঞান প্রতিভা আর কারিগরী বিদ্যায় নিপুণতার কাছে সে বাধাও হার মানলো, তৈরি হল ভূপৃষ্ঠচাকীর মহাচক্ররথ। আমি সেই চক্ররথ চালিয়ে ঘূর্ণ্য-বর্মের তৈরি প্রশস্ত সুড়ঙ্গ পথে ঊর্ধ্ব বিহার শুরু করলাম। হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে আমার বেশি দেরি হল না। বরফাচ্ছাদিত হিমালয়ের একটা জায়গায় মাটি ফুঁড়ে বের হলাম আমি। আমার পরনে ছিল ভূ-সুট, তাই ওখানকার হাড় কাঁপানো শীত আমাকে ছুঁতেই পারল না। আমি চক্ররথে করে গোটা পৃথিবীতে একটা চক্কর দিয়ে এলাম। অসংখ্য জনপদ, নদী, পাহাড়, সমুদ্র, অরণ্য আর সুবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র দেখতে খুবই ভাল লাগল, কারণ মহাপাতালে এ সব দৃশ্য দেখা যায় না। ভাল লাগল সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত, আকাশে মেঘ, বৃষ্টি, ভাল লাগল রাতের অন্ধকারে আকাশ ভরা তারা। সূর্যের চোখ ধাঁধানো রোদ আর আলো আমার কোনো ক্ষতি করতে পারেনি, কারণ বিশেষ ধরনের স্বচ্ছ ধাতুতে আমার দু'চোখ ছিল ঢাকা। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ মহাপাতালের তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র বলে শরীরটা এত হাল্কা লাগছিল যে, মনে হয়েছিল যেন ডি-গ্র্যাভিটি ধাতুর পোশাক পরে আছি আমি। আমাদের দেশের এথলেটেরা যদি তোমাদের পৃথিবীর খেলাধুলার প্রতিযোগিতায় নামে তবে সবাইকে সে গো-হারা করে দেবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।"

আমার মনে পড়ল, বলে উঠলাম,—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, উড়ন্ত সসার বা উড়ন্ত চাকতি নিয়ে বছর খানেক আগে পৃথিবীর কাগজগুলোতে খুব হইচই হয়েছিল বটে, আমি তো মনে করেছিলাম যে ও সব সাংবাদিকদের পেট-বানানো কথা—"

"না, সত্যিই পৃথিবীর মানুষ মাঝে মাঝে দেখতে পেয়েছিল আমার উড়ন্ত চক্ররথকে, কারণ যদিও আমি বেশির ভাগ সময়েই খুব উঁচু দিয়ে উড়ছিলাম, তবু মাঝে মাঝে নিচের দৃশ্যগুলো আরও ভাল করে দেখবার জন্য নিচে নেমে আসছিলাম—"

আমি বলে উঠলাম,—"কী আশ্চর্য! আপনি নিচে নেমে পৃথিবীর মানুষের সঙ্গে দেখা করলেন না কেন?"

পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"সাহস হল না। যদি তোমরা আমাকে আর ফিরে আসতে না দিতে। তা ছাড়া পরস্পরের সঙ্গে কথা বলবার জন্য এই ইলেকট্রনিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্রের আবিষ্কার হয়নি তখনো। সে যাক, আসল কথায় আসি এবার। পৃথিবী পরিভ্রমণ শেষ করে যা কিছু দেখবার জানবার দেখে জেনে নিয়ে আমি আমার চক্ররথ নিয়ে ফিরে এলাম হিমালয়ের উত্তুঙ্গ চূড়ায় আমাদের সুড়ঙ্গ-মুখে, আর ঠিক তখনি নীনাকে দেখতে পেলাম। ওই অপরিসীম উঁচু চূড়ায় ও কেন বা কিভাবে এসেছিল জানি না, কিন্তু ওকে দেখামাত্র আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল। ভাবলাম, শুধু হাতে ফিরে না গিয়ে পৃথিবী থেকে একটা জীবন্ত মানুষ ধরে নিয়ে গেলে কেমন হয়। যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। চক্ররথ থেকে নেমে আমি এগিয়ে গেলাম মেয়েটার দিকে। ভূ-সুট পরা আমার কিম্ভুত চেহারা দেখে মেয়েটা ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, কিছু দূরে অদ্ভুত পোশাক পরা কতকগুলো লোক ছিল তারা চিৎকার শুনে এগিয়ে এল। তারপর হঠাৎ আমাকে দেখে থমকে দাঁড়ালো। আমি ওদের তাড়া করলাম। পৃথিবীতে আমার শরীর এত হাল্কা যে, এক এক লাফেই আমি অনেক দূরত্ব অতিক্রম করতে পেরেছিলাম। লোকগুলো ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল —'ইয়েতি ইয়েতি—' তারপর পালাতে লাগলো। অজ্ঞান-রশ্মি দিয়ে মেয়েটাকে অজ্ঞান করে ওকে কাঁধে তুলে আমি চক্ররথে ফিরে এলাম। তারপর সুড়ঙ্গ পথ ধরে সটান এই মহাপাতালে। সেই থেকে এই এক বছর ধরে নীনা আমার কাছেই আছে—"

শেষের দিকে পিন্টিনিকোলাবলের কণ্ঠস্বর আশ্চর্যভাবে মৃদু আর কোমল শোনালো।

একটু থেমে পিন্টিনিকোলাবল আস্তে আস্তে বলল,—"এই এক বছর ধরে নীনাকে আমি তিলে তিলে ভালবেসেছি, ওর সঙ্গে কথা বলবার জন্য আমি এই ইলেকট্রনিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছি। ওর রূপ, ওর যৌবন আমাকে মোহগ্রস্ত করে রেখেছে, আমার হৃদয় আজ নীনাময় হয়ে গেছে। আপনি, আপনি আমাকে সাহায্য করুন, অরবিন্দ। এর বিনিময়ে আপনি যা চান তাই আপনাকে দেব, আপনাকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার পথ বলে দেব—"

পিন্টিনিকোলাবলের কণ্ঠস্বর গভীর আবেগে থর থর করে কাঁপতে লাগলো, আর আমি অবাক বিস্ময়ে প্রেমের এই বিভিন্ন মহিমা প্রত্যক্ষ করে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। কী মহৎ এই প্রেম যা মহাপাতালের এই অদ্ভুত প্রাণীকে তার জাতিগত ও ধর্মগত সংস্কারের বহু ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। সে ভুলে গেছে তার আত্মীয়-পরিজনের কথা, ভুলে গেছে সিম্বিলিকোলাপ্টা জাতির বিজ্ঞান-সিদ্ধির কথা, সব ভুলে সে একটি মাটির পৃথিবীর মেয়ের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আমি বললাম,—"কিন্তু আমাকে কী করতে হবে তা বললেন না তো?"

"আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন। আমি ওকে যে কতটা ভালবাসি তা আমার মুখের কথা শুনে বিশ্বাস করছে না, মনে মনে আমাকে এখনো ভয় পায় ও। আপনি ওর দেশের লোক, আপনার কথা ও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে—"

পিন্টিনিকোলাবল আবার আমার হাত দুটো চেপে ধরল।

আমি বললাম,—"কিন্তু সিম্বিলিকোলাপ্টা সমাজ এই অসম মিলনে রাজি হবে কি?"

ও ফিসফিস করে বলল,—"তা তো রাজি হবে না, এমনকি আমার হাবভাব দেখে নিয়ামক কেন্দ্রে এরই মধ্যে ফুসফাস শুরু হয়েছে, তাই দেরিও করা চলে না আর—"

"তবে—"

"সে সব আমি ঠিক করেই রেখেছি। নীনা যদি আমার হতে রাজি হয়, তবে ওকে নিয়ে আমি পালিয়ে যাব গিণ্ডিয়াগোনাগুাপ্পাদের রাজ্যে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থী হয়ে, ওরা আমাকে ভরসা দিয়েছে—"

"শুধু শুধু ওরা তোমাদের আশ্রয় দেবে কেন?"

"শুধু শুধু নয়, শুধু শুধু নয়, কোনো কিছুর বিনিময়ে,—মানে এতে ওদেরও কিছু স্বার্থসিদ্ধি হবে বলেই—"

এখানে আমি ব্যাপারটা জলের মতো বুঝতে পারলাম, বললাম—"ছিঃ পিন্টিনিকোলাবল,—এমন সর্বনাশা কথা মনেও এনো না তুমি। এ যে দেশের প্রতি, জাতির প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা—"

ও কাতর হয়ে বলল,—"তবে আমি কী করব বল? নীনাহীন জীবন যে আমি কল্পনাও করতে পারি না—"

আমার মাথায় একটা মতলব খেলে গেল, বললাম,—"নীনা যদি তোমাকে সত্যিই ভালবাসতে পারে তবে আমাদের পৃথিবী তোমাদের যুগল প্রেমকে স্বাগত জানাবে—"

অপরিসীম কৃতজ্ঞতায় ওর চোখ দুটো ছল ছল করতে লাগল, অনেকক্ষণ ওর মুখে কোনো কথা জোগালো না। শুধু ওর হাতে ধরা আমার হাতটাতে একটা একটা নিবিড় চাপ অনুভব করলাম।

আমি বললাম, "তা হলে তো নীনার সঙ্গে একবার দেখা করতে হয়—"

ও বলল,—"সবুজ রোম অঞ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলির ফিরতে এখনো বেশ কিছুটা দেরি আছে। বাইরে আমার চক্ররথ প্রস্তুত, চলো তোমাকে আমার বাড়িটা দেখিয়ে নিয়ে আসি। নীনার সঙ্গে তোমার প্রথম আলাপটা হয়ে যাক—তারপর বিকেলে ওকে নিয়ে এখানে আসব আমি—"

কথাবার্তা বলতে বলতে কখন যে 'আপনি তুমি'র ব্যবধান ঘুচে গিয়েছিল সে খেয়াল ছিল না, কিছুক্ষণের আলাপেই ও আমার কত আপনজনই না হয়ে গেল।

আমি বললাম,—"বেশ তা হলে চলো, ... কিন্তু—"

"আর কিন্তু-টিন্তু নয়, চলো এবার"—বলে জোর করেই আমাকে টেনে বাইরে নিয়ে এল পিন্টিনিকোলাবল। আমি আর আপত্তি করতে পারলাম না।

বাইরে ওর ছোট্ট ছিমছাম চক্ররথটি দাঁড়িয়েছিল। আমরা ওর ওপর উঠে দাঁড়াতেই ওটা শূন্যে ভাসল।

অশ্চলবলগলর বাড়ি থেকে পিন্টিনিকোলাবলর বাড়ি প্রায় পাঁচশো মাইল দূরে। চক্ররথে যেতে অবশ্য বেশিক্ষণ লাগল না।

শূন্য পথে উড়ে যেতে যেতে আমি নিচে তাকিয়ে নীল আলোয় উদ্ভাসিত প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কারখানায় নিরলস কর্মরত সিম্বিলিকোলাপ্টাদের দেখতে পেলাম, দেখতে পেলাম বহুদূর বিস্তৃত বিজ্ঞানশালাগুলোতে বৈজ্ঞানিকদের একাগ্রচিত্ত গবেষণা।

আমি চোখ ফিরিয়ে পিন্টিনিকোলাবলকে বললাম,—"তোমাদের এইসব বিরাট বিরাট কারখানাগুলোতে অনবরত কী তৈরি হচ্ছে?"

ও বলল,—"কোনো কোনো কারখানায় তৈরি হয় জাতীয় পুষ্টির জন্য আলোক-খাদ্য, কোনোটা তৈরি করে চলেছে লাখে লাখে টেলিভিসোস্কোপ। প্রসূতি সদনে ডিম-শিশুদের প্রাথমিক মৌলিক শিক্ষা দেবার যন্ত্রপাতি তৈরি করবার কাজে লেগে আছে অনেকগুলো কারখানা। আর যে সব কারখানার চারপাশে লাল রোম প্রহরীদের কড়া পাহারা দেখছ, সেগুলোতে তৈরি হচ্ছে জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য মারাত্মক মারণ-রশ্মিগুলো। এছাড়া গবেষণা করে নিত্য নতুন এক্সপেরিমেন্টগুলো সফল করে তোলবার জন্য প্রযোগ কুশলী যন্ত্রবিদদের নিয়েও কয়েকটি কারখানা আছে—"

"এগুলো দেখতে হলে মহানিয়ামক কেন্দ্রের বিশেষ অনুমতি চাই, তাই না?"

পিন্টিনিকোলাবল ওদের দেশের রীতিসম্মতভাবে হেসে উঠল যেন, বলল,—"না, না, তা কেন? একমাত্র প্রতিরক্ষার জন্য আলাদা করে রাখা বিজ্ঞানশালা আর কারখানাগুলো ছাড়া আর সবগুলোই সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত—"

"কিন্তু আমি তো বিদেশী, তোমাদের সর্বসাধারণের মধ্যে পড়ি না—আমিও কি—"

একটু ভেবে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"দেখতে চাও আমাদের বিজ্ঞানশালা আর কারখানা? বেশি সময় পাবে না কিন্তু—"

চক্ররথের সামনের দিকের গতি সহসা রুদ্ধ হয়ে গেল, তারপর দ্রুতবেগে নিচের দিকে নামতে লাগলো খাড়াভাবে। দেখতে দেখতে একটা বড় বিজ্ঞানশালার কাছে ভূমি স্পর্শ করল আমাদের চক্ররথ।

অনেক উঁচু থেকে যেটাকে একটা দেশলাই-এর বাকসের মতো মনে হয়েছিল, কাছে গিয়ে দেখলাম সেটা বিরাট এক অট্টালিকা। লম্বায় চারশো মিটার, চওড়ায় আড়াইশো মিটার আর উঁচু প্রায় আশিমিটার। বাতায়নহীন দেওয়ালগুলি খাড়া ওপরে উঠে গেছে, সে দিকে মাথা তুলে তাকাতে গিয়ে মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল। লক্ষ্য করলাম যে, ছাদের ঠিক নিচে সারি সারি গোল ভেন্টিলেটার বায়ু চলাচলের পথ অব্যাহত রেখেছে।

বিশাল বিজ্ঞানশালার সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমরা, এক পাশে ছোট একটা আলাদা ঘরে দু'জন হলদে রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা বসেছিল। পিন্টিনিকোলাবলকে দেখে তারা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, মাথা নুইয়ে অভিবাদন জানালো। আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে বিজ্ঞানশালার দেওয়ালগুলো কী ধাতু দিয়ে তৈরি তাই ভাবতে লাগলাম। দেওয়াল বলতেই আমাদের মনে যে ইট, চুন, সুরকি, সিমেন্টের কথা ভেসে আসে, এ দেশের দেওয়াল তাদের চিহ্ন মাত্র নেই, পৃথিবীর মানুষের অজানা কী একটা সংকর ধাতুর পাত দিয়ে এরা এই বিরাট বিরাট দেওয়ালগুলো তৈরি করেছে যার গা থেকে একটা স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

ওদের তিনজনের মধ্যে কী কী কথাবার্তা হল জানি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই হলদে রোম সিম্বিলিকোলাপ্টাদের একজন তার কেবিনের দেওয়ালের বসানো একটা লিভার টেনে ধরতেই নিঃশব্দে দেওয়ালের একটা অংশ গুটিয়ে ওপরের দিকে উঠে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম আমি আর পিন্টিনিকোলাবল।

বিংশ শতাব্দীর মানুষ আমি, তাই আধুনিক বিজ্ঞানাগার অপরিচিত নয় আমার কাছে। দেশ-বিদেশে অনেক পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্র দেখেছি, দেখেছি অতি আধুনিক জটিলতম সব যন্ত্রপাতি কিন্তু মহাপাতালের এই বিপুল বিশাল গবেষণাগারের ভেতরে ঢুকে মনে হল যে সেগুলো নেহাৎই ছেলেখেলা।

পারাপার চিহ্নহীন নদীর মতো বিশাল হলঘরটি তীব্র উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে, কর্মের স্রোত হয়ে যাচ্ছে, হাজার হাজার নীল-লাল রোম সিম্বিলিকোলাপ্টা এক মনে কাজ করে যাচ্ছে। অপরিসীম স্তব্ধতায় গোটা বিজ্ঞানগারটি ডুবে আছে। মানুষের সুদূরতম কল্পনাতেও আসে না এমন সব বিচিত্র গঠন জটিল যন্ত্র হলঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। যন্ত্রগুলির আয়তন যেমন বিপুল, তেমনি সূক্ষ্ম তাদের ক্রিয়াকলাপ।

কাছেই একজন নীল-রোম সিম্বিলিকোলাপ্ট। একটা যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে এক মনে তার বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। আমরা তার পাশে গিয়ে দাঁড়াতে সে একটিবার মুখ তুলে তাকিয়ে আবার তার কাজ করে যেতে লাগল এক মনে।

যন্ত্রটা প্রায় তিরিশ ফুট উঁচু হবে, মাথায় ফানেলের মতো একটা ধাতুর টুপি পরানো, চারপাশে ব্লাস্ট ফার্নেসের কাউপার স্টোভের মতো দেখতে আটটা ধাতব পাত্র বসানো। মূল যন্ত্রের নিচের দিকে একটা মুখঢাকা স্বচ্ছ কুড়ি ফুট ব্যাসের প্যান বসানো, তার ভেতর কী একটা তরল পদার্থ টগবগ করে ফুটছে আর বিদ্যুৎ শিখার মতো চোখ ধাঁধানো আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। প্যানের গায়ে একসারি নানা ধরনের মিটার বসানো, তাদের কাঁটাগুলো মাঝে মাঝে লাফিয়ে উঠছে। প্যানের নিচে আর একটা ফানেল। ফ্যানেলের দু'ফুট ব্যাসের সরু নলটা ঘুরে একটা গম্বুজাকৃতি যন্ত্রের ভেতরে গিয়ে অদৃশ্য হয়েছে। প্যানের ওপরের দিকে সারি সারি টিউবগুলো পাশের ওই আটটা ধাতব পাত্রের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

নীল-রোম বৈজ্ঞানিকের চোখ ছিল ওই সারি সারি মিটারের ওপর। তার হাতের কাছে একটা লিভার ছিল, মাঝে মাঝে সে সেটা কয়েক ঘর সরিয়ে দিচ্ছিল।

স্বচ্ছ প্যানটা যদিও আগাগোড়া ঢাকা, তবু ভেতরের তরল পদার্থের রং দেখেই আমি বুঝতে পারলাম কী ভীষণ উত্তাপে ওঠা বিগলিত হয়েছে, অথচ আমরা এত কাছে দাঁড়িয়ে থেকেও বিন্দুমাত্র তাপ অনুভব করতে পারছি না।

আমার ইলেকট্রনিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্রের মাধ্যমে সে কথাটা পিন্টিনিকোলাবলকে জানালাম, সে বলল,—"এতে অবাক হবার কিছুই নেই, অরবিন্দ। তাপও একটা এনার্জি, আমরা সে এনার্জির এতটুকু অপচয়ও চাই না, ওই আটটা স্টোভের চারটাতে তাপ আর অন্য চারটেতে বিদ্যুৎ সঞ্চয় করা হচ্ছে।"

আমি বললাম,—"কোনো জ্বালানী দেখছি না, ইলেকট্রোড দেখছি না, তা হলে ওই ফুটন্ত তরল পদার্থটি তার তাপের জোগান পাচ্ছে কোত্থেকে? নাকি এটা কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া থেকে পাওয়া তাপ?"

"না অরবিন্দ, কোনো রাসায়নিক ক্রিয়া থেকে এত তাপ পাওয়া সম্ভব নয়। ওই তরল পদার্থটির স্ফুটনাঙ্ক কত জানো?"

"না—"

"তোমাদের পৃথিবীর হিসেবে দশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। নিচে ওই যে ফানেল দেখছ সেখানে অনবরত হাইড্রোজেনের পরমাণু ভাঙা হচ্ছে, তার থেকে যে ভীষণ তাপ সৃষ্টি হচ্ছে তার কিছু অংশ নিয়ে এখানে কাজ করা হচ্ছে। এই তরল পদার্থটি কি তা জানো?"

"না—"

"এর নাম সিম্বিলিনিয়াম, এটা একটা এলিমেন্ট। তোমাদের ভূপৃষ্ঠের বৈজ্ঞানিকরা মাত্র বিরানব্বইটি মৌলিক ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন, কিন্তু মহাপাতালের বৈজ্ঞানিকরা এরই মধ্যে একশোটি মৌলিক ধাতুর সন্ধান পেয়েছেন, এবং আমরা আশা করি যতই আমার পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে নমুনা সংগ্রহ করব, ততই নিত্য নতুন মৌলিক ধাতুর সন্ধান পাব। এই সিম্বিলিনিয়াম নামে মৌলিক ধাতুটি হালে আবিষ্কৃত হয়েছে। আমাদের ঘূর্ণ্য-বর্ম মাটির নিচে প্রায় ছ'হাজার মাইল নিচে থেকে অন্যান্য ধাতুর সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় এটা নিয়ে আসে। ভয়ঙ্কর তেজস্ক্রিয় এই সিম্বিলিনিয়ামের এটমিক ওজন হচ্ছে তিনশো এক দশমিক শূন্য তিন, ইলেকট্রন লেয়ার দুই দশ একচল্লিশ আটত্রিশ বাইশ আট দুই, এর অন্যান্য গুণ আর ধর্ম নিয়ে এখন পরীক্ষা চালাচ্ছেন এই নীল-রোম বৈজ্ঞানিক। সফল হলে এঁর সবুজ-রোম প্রোমোশন আটকায় কে?"

আমি স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ—বিজ্ঞানশাস্ত্রে আমার তেমন পাণ্ডিত্য নেই, তাই পিন্টিনিকোলাবলর শেষের কথাগুলো ভাল বুঝলাম না।

একটু পরে অন্য একটা কথা মনে এল আমার, বললাম,—"আচ্ছা, দশ হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো সোজা উত্তাপ নয়, যে কোনো ধাতুরই তো ওই ভীষণ উত্তাপে গলে যাবার কথা। ওই প্যানটা তা হলে টিকে আছে কি করে?"

"কাচের মতো স্বচ্ছ ওই প্যানটা জটিল রাসায়নিক ক্রিয়ায় প্রস্তুত একটা উচ্চতাপ সহনক্ষম এ্যালয় দিয়ে তৈরি, ভেতরে একটা তাপনিবারণী বিশেষ প্রলেপ দেওয়া আছে আর বাইরে তো তাপ আসতেই পারছে না, তার আগেই চলে যাচ্ছে স্টোভগুলোতে। আমরা হাজার বছর আগে যে অবস্থায় ছিলাম তোমাদের পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা এখন মাত্র সে অবস্থায় পৌঁছেছে। তাই আমাদের বিজ্ঞানজগতের সব কিছু জটিল প্রক্রিয়া তুমি ঠিক বুঝবে না। তবে এটুকু জেনে রাখ যে, লোহা প্রস্তুত করতে গিয়ে আকরিক লোহা খনি থেকে তুলে এনে ব্লাস্ট ফার্নেসে গলিয়ে, শোধন করে লৌহপিণ্ড তৈরি করবার দিনের কথা আমরা ভুলেই গেছি, পদার্থের ইলেকট্রনের সংযোজন বিয়োজন থেকেই আমরা আমাদের মৌলিক ধাতু বা সংকর ধাতু তৈরি করে নিই। তাই এক ধাতুকে অন্য ধাতুতে পরিণত করা এখানে মুহূর্তের ব্যাপার। অবশ্য ইলেকট্রন সংযোজন বা বিয়োজন অত্যন্ত জটিল কাজ, তার জন্য বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি দরকার, নানা ধরনের অদৃশ্য রশ্মি দরকার।"

পিন্টিনিকোলাবলের কথা শুনতে শুনতে আমার মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, ক্ষীণ কণ্ঠে বললাম,—"আর না, এবার চলো—"

"সে কি। একটা যন্ত্র দেখেই আশ মিটে গেল? ও দিকটা দেখবে না?"

"না, না, আর না, চলো, আমার মাথা ঘুরছে—"

বিজ্ঞানশালা থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

মহাপাতালে দিন নেই, রাত নেই, সব সময়েই গোধূলি আলো। তাই সময়ের সূর্যঘড়ি না থাকায় আমার হাতঘড়ির দিকেই তাকালাম। আমার সচল ঘড়ির সাক্ষ্য অনুসারে কলকাতার সময় যখন সাড়ে ন'টা তখন আমাদের চক্ররথ পিন্টিনিকোলাবলর বাড়ির সামনে এসে নামল।

হাসিমুখে আমার হাত ধরে বাড়ির ভেতরে নিয়ে গেল পিন্টিনিকোলাবল।

আগের দিন টেলিভিসোস্কোপে যেমনটি দেখেছিলাম ঠিক তেমনটিই তার ঘর-দুয়ার। আশ্চর্য স্নিগ্ধ সোনালী আলোতে দু'চোখ যেন জুড়িয়ে গেল।

ইলেকট্রনিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটর যন্ত্রের ভেতর দিয়ে পিন্টিনিকোলাবলর খুশির সমুদ্রে ডুব দিয়ে আসা অ্যানটেনা স্বর শুনতে পেলাম,—"নীনা, নীনা, কোথায় তুমি? দেখ, কাকে ধরে এনেছি—"

নীরবে দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালো একটি মর্ত্য-তরুণী।

এই মহাপাতালে, চারদিকে অদ্ভুতদর্শন পিপীলিকার সমগোত্রীয় সিম্বিলিকোলাপ্টাদের দেখে দেখে ক্লান্ত আমার চোখ দুটো অসীম আনন্দে নেচে উঠল। মনের ভেতর গুনগুনিয়ে উঠল বহুদিন আগে পড়া রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার কয়েকটি লাইন

"হেনকালে হাতে দীপশিখা
ধীরে ধীরে নামি এল মোর মালবিকা।
দেখা দিল দ্বারপ্রান্তে সোপানের 'পরে
সন্ধ্যার লক্ষ্মীর মতো সন্ধ্যাতারা করে।"

আমাকে দেখে নীনাও কম অবাক হয়নি। হঠাৎ ওর চোখ দুটি জ্বলে উঠল, ছুটে এসে আমার বুকে মাথা রেখে ও উচ্ছ্বসিত ক্রন্দন বেগে ভেঙে পড়ল। আমি বুঝতে পারলাম যে, এক বছরের চেয়েও বেশিদিন এই আত্মীয়স্বজনবন্ধুহীন স্তব্ধ পাতালপুরীতে থাকার পর হঠাৎ একজন পৃথিবীর মানুষকে দেখতে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেছে সে, আর তাই তার দু'চোখ বেয়ে ঝরে পড়ছে আনন্দাশ্রু।

স্তব্ধতার রাজ্যে ওর ফোঁপানির মৃদু শব্দ যেন আমার কানে অমৃত বর্ষণ করল; মানবীর কণ্ঠস্বর শোনার আকুল আগ্রহ নিয়ে ওর কাঁপা পিঠে মৃদু চাপড় দিতে দিতে বললাম,—"আর কেঁদ না নীনা, দুঃখের দিনের অবসান হয়েছে, এই তো আমরা দু'জন পৃথিবীর মানুষ কাছাকাছি চলে এসেছি—"

নীনা মুখ তুলে চোখ মুছে অবাক হয়ে নেপালী ভাষায় বলল,—"তুমি নেপালী জানো?"

"জানি বৈ কি নীনা, পর্বতারোহী আমি, নেপালী শেরপাদের নিয়েই আমার কারবার, আর আমি নেপালী ভাষা জানব না?"

"পর্বতারোহী, তবে কি তুমিই—"

"আমিই অরবিন্দ মজুমদার,—নামটা শুনেছ নিশ্চয়ই—"

হাসি মুখে ঘাড় কাৎ করে নীনা বলল,—"শুনিনি আবার। তোমার নাম তো নেপালের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও জানে—"

পরিহাস করে বললাম,—"আর তুমি? তুমিও কি বাচ্চা মেয়ে নাকি?"

লজ্জার ঘন রক্তিম ছায়া নামলো ওর মুখে চোখে, মহাপাতালে প্রস্তুত কৃত্রিম রেশমের সূক্ষ্ম স্বচ্ছ শাড়ির আঁচল দিয়ে ওর পুরন্ত বুক ঢাকতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে হেসে উঠলো সে,—কৃত্রিম কোপে ভুরু কুঁচকে বলল,—"যাও, বড্ড দুষ্টু তুমি—"

যে অন্তরঙ্গতায় পৌঁছুতে পৃথিবীর এক যুগ হয়তো কেটে যেত, এখানে, এই নির্বান্ধব মহাপাতালে আমরা সেই অন্তরঙ্গতায় পৌঁছে গেলাম কয়েক মিনিটের মধ্যে।

নীনার মুখে সপ্রেম চোখে তাকালাম। ওর প্রায় গোল মুখ, ঈষৎ চাপা নাক, তির্যক চোখ আর যৌবন-জোয়ারে টলমল দেহখানা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম। মনে হল, "ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে—"

আমাদের প্রথম উচ্ছ্বাসে ভাঁটা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে পিন্টিনিকোলাবলর কথা মনে পড়ল। আত্মগ্লানিতে আমার মন ভরে উঠল। দেখলাম, অল্পদূরে দেওয়াল ঘেঁষা চেয়ারে বসে স্মিতমুখে সে আমাদের আমাদের আনন্দোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করছে।

আমাকে তাকাতে দেখে ও উঠে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাত বাড়িয়ে আমার ডান হাতটা নিবিড়ভাবে চেপে ধরল, বলল,—"তোমাকে কি বলে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবো জানি না অরবিন্দ, তোমার জন্যই আজ সর্বপ্রথম নীনাকে হাসতে দেখলাম, এতে যে আমার কী আনন্দ—"

আবেগ এসে তার অ্যানটেনা-কম্পন রুদ্ধ করে দিল, কথাটা আর শেষ করতে পারল না সে।

নাচতে নাচতে পাশের ঘরে চলে গেল নীনা, একটু পরেই ফিরে এল একটা আলো বিকিরণকারী ছোট বাকস হাতে নিয়ে।

আনন্দে উজ্জ্বল মুখে বাক্সের ডালা খুলে আমার সামনে তুলে ধরল নীনা, বলল,—"এই দেখ, আমার বন্ধু পিন্টিনিকোলাবল কত কিছু উপহার দিয়েছে আমাকে—"

বাকসের ভেতরের চোখ ঝলসানো জিনিসগুলো দেখতে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্য আমি যেন অন্ধ হয়ে গেলাম। একটু পরে চোখটা একটু সরে এলে পর দেখলাম ভেতরটাতে সূর্যের উজ্জ্বল আলো বেঁধে রাখা দীপ্তিতে ঝলমল করছে কয়েকটি অলঙ্কার। ওগুলো যে কোন বহুমূল্য ধাতুতে তৈরি, তা বুঝতে পারলাম না।

আমার বিমূঢ় মুখে একটা সকৌতুক কটাক্ষ নিক্ষেপ করে নীনা বলল,—"বাক্সটা কী দিয়ে তৈরি বলো তো—"

আমি মাথা চুলকে বললাম,—"বলতে পারছি না—"

পিন্টিনিকোলাবলর মুখে একবার তাকিয়ে নীনা বলল,—"হীরে দিয়ে তৈরি—"

"হীরে দিয়ে। সে কি।"

পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"হ্যাঁ, সত্যিই হীরের বাক্স ওটা—"

আংটিতে বা মেয়েদের হীরের লকেটে এক আধ টুকরো হীরে যে না দেখেছি তা নয়, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হীরের ওজনটাও জানি, কিন্তু প্রায় তিন কিলোগ্রাম ওজনের হীরের বাক্স। নাঃ, আমার মাথাটা দেখছি নিতান্তই খারাপ করে দেবার তালে আছে এরা।

অবিশ্বাসের সুরে বললাম,—"কিন্তু তা কী করে সম্ভব, পিন্টিনিকোলাবল? হীরে তো কঠিন পদার্থ, তাকে তরল করাই যায় না, উত্তাপ প্রয়োগে সে তো শুদ্ধ কার্বনে পরিণত হয়ে যায়।"

আমার ইলেকট্রনিক কমপিউটার-কাম-ট্রান্সলেটরের ভেতর দিয়ে প্রথমে যে শব্দটা শুনতে পেলাম তাকে অনেকটা পৃথিবীর অট্টহাসির সঙ্গেই তুলনা করা যায়। হাসি থামিয়ে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"তোমাকে আগেই বলেছি, তোমাদের সীমাবদ্ধ বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণা দিয়ে মহাপাতালের সব কিছু বিচার করতে যেও না, ঠকবে। শুধু এটুকু জেনে রাখো যে, প্রচণ্ড চাপ আর তাপের প্রয়োগে

হীরেকেও তরল করবার মতো যন্ত্র আছে এ দেশে,—কিন্তু আজ এ পর্যন্তই থাক, অশ্চলবলগলর ফেরবার সময় হয়ে এল, চলো, তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসি—"

আমার হাত চেপে ধরে নীনা ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল,—"এই এলে, এরই মধ্যে যাবে?"

আমি তার রাঙা টুকটুকে গাল দুটো টিপে দিয়ে বললাম,—"আবার দেখা হবে সন্ধ্যায়। তৈরি হয়ে থেকো, পিন্টিনিকোলাবল তোমাকে নিয়ে যাবে আমার ওখানে।"

হাসি ফুটলো নীনার মুখে, ওর মুখ দেখে মনে হল যেন ও এক্ষুনি বাইরে যাবার জন্য তৈরি হয়ে নেবে।

নীনার হাসি মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে—আমার হাতে মৃদু টান দিয়ে বাইরে চলে এল পিন্টিনিকোলাবল।

চক্ররথ আবার নিঃশব্দে মহাপাতালের মহাকাশে উড়ল, চোখের পলকে ওপরের দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে থাকা নীনা, তার বাড়ির সব অদৃশ্য হয়ে গেল। পায়ের নিচে বহু বিস্তৃত বিজ্ঞানাগার আর কারখানাগুলো ছোট ছোট খেলাঘরের মতো দেখালো, দেখতে পেলাম লাল-নীল-সবুজ-হলুদ নানা আলোর অজস্র সংকেত, যেন নানা রং-এর তারার মালা গাঁথা রাতের আকাশ। বিদ্যুৎ চমকের মতো আমাদের আশপাশ দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল নানা আকারের অনেক চক্ররথ।

বিমনাভাবে চক্ররথ চালাচ্ছিল পিন্টিনিকোলাবল, আমি বুঝলাম যে তার মন আজ নীনাতে আচ্ছন্ন হয়ে আছে। যতই আমি নীনার প্রতি তার অতল সমুদ্রের মতো গভীর ভালবাসার পরিচয় পাচ্ছিলাম, ততই একটা বিষণ্ণতার পাষাণ ভার আমার বুকে চেপে বসছিল। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, ওর প্রেমের এই তরুণীটি কোনো দিনই মিলনের তীরে ভিড়বে না। মরে গেলেও নীনা তাকে ভালবাসতে পারবে না, বড় জোর বন্ধু হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারবে, কিন্তু তার বেশি কিছু দেওয়া অসম্ভব হবে তার পক্ষে।

আমি তার চিন্তার মোড় ফেরাবার জন্য বললাম,—"আচ্ছা, তোমাদের এই আকাশে তো আমাদের আকাশের মতো অসীম নয়, পিন্টিনিকোলাবল—"

ও অন্যমনস্কভাবে জবাব দিল,—"না, আমাদের আকাশ ওপারের দিকে হাজার মাইল, তার ওপরে আছে পৃথিবীর হাজার মাইল পুরু শিলাস্তর—"

ওকে কথা বলতে অনিচ্ছুক দেখে আমি চুপ করে রইলাম। শব্দহীন স্তব্ধ রাজ্যে আমাদের চক্ররথ তীব্র বেগে উড়ে চলল বটে কিন্তু গতির কোনো অনুভূতি পাচ্ছিলাম না আমি।

কিছুক্ষণ এমনি চুপচাপ কেটে গেল, হঠাৎ পিন্টিনিকোলাবল তার বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাত বাড়িয়ে আমাকে স্পর্শ করল,—"অরবিন্দ, আজ তুমি আমাকে এক মহা সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচিয়েছ—"

আমি কিছুই না বুঝে বললাম,—"কী করে?"

"নীনাকে পাবার আশায় আমার হিতাহিত জ্ঞান লুপ্ত হয়েছিল, তাই দেশের সর্বনাশ করে গিণ্ডিয়াগোনাণ্ডাপ্পাদের কাছে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গোপন তথ্য ফাঁস করবার চিন্তা আমার মনে উঁকি দিয়েছিল। তোমার কথায় আমি আমার শুভবুদ্ধি ফিরে পেয়েছি। নীনার প্রতি আমার প্রেম সত্য ও শাশ্বত, কিন্তু তা দেশপ্রেমের চেয়ে বড় হতেই পারে না। দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে নীনার প্রতি আমার প্রেমও যে কালিমালিপ্ত হয়ে যাবে, এ কথাটা আমার মনেই হয়নি। তুমি আমাকে রক্ষা করেছে, অরবিন্দ—"

আমি সহানুভূতির স্বরে বললাম,—"সকলেরই ভুল হয়ে থাকে, পিন্টিনিকোলাবল, কিন্তু ভুল ধরা পড়লে যে সেটা সংশোধন করে নেবার সাহস রাখে, সে-ই প্রশংসা পায়। তোমার মনে যে অনুতাপ এসেছে তার তাপে তোমার ভুলটুকু গলে গিয়ে খাঁটি দেশপ্রেম দেখা দিয়েছে। তুমি এখন অগ্নিশুদ্ধ, পরম পবিত্র।"

কথায় কথায় আমরা যে অশ্চলবলগলর বাড়ির কাছাকাছি চলে এসেছি, সে খেয়াল আমার ছিল না। হঠাৎ চক্ররথের গতি মন্থর হওয়াতে আমার চমক ভাঙলো। নিচে তাকিয়ে গোলাপী আভায় উজ্জ্বল বাড়িটা চোখে পড়ল।

আমি বললাম,—"অশ্চলবলগলর সঙ্গে আমি প্রথম যে দিন এ বাড়িতে আসি, সেদিন কিন্তু চক্ররথে ওর বাড়ির দোরগোড়ায় পৌঁছুতে পারিনি, লিফট দিয়ে নামতে হয়েছিল নিচে। তারপর নানা পথ ঘুরে তার বাড়িতে গিয়েছিলাম,—কিন্তু তোমার চক্ররথ কি করে একেবারে নিচে চলে এল?"

নিচের দিকে নামতে নামতে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"সাধারণভাবে আমাদের দেশটা দোতলা। ওপর তলায় যত সব নীলাভ আলোর কলকারখানা আর সবুজ আলোর বিজ্ঞান শাখা। এছাড়া এখান থেকে হাজার মাইল দূরে আছে হলদে আলোর বিশাল প্রসূতি সদন, অদৃশ্য রশ্মির আলোক দৈত্যগুলো সেখানে দিবারাত্র পাহারা দিচ্ছে। এর ছ'মাইল নিচে একতলায় হচ্ছে সিম্বিলিকোপ্টারের বাসস্থান। অশ্চলবলগল সেদিন শর্টকার্ট রাস্তায় বাড়ি গেছিল, তাই লিফটের বাইরে চক্ররথ রেখে নিচে নেমে গেছিল। এখান থেকে দু'শো মাইল পুবে ওপরতলা থেকে নিচের তলায় চক্ররথ যাবার সুড়ঙ্গ পথ আছে, আমি এলাম সেই পথে—এই যে আমরা পৌঁছে গেছি।"

আমাকে নামিয়ে দিয়ে হাত নেড়ে চলে গেল পিন্টিনিকোলাবল।

ছয়
(মুক্তি)

আরও একমাস কেটে গেল। প্রায় প্রতিদিনই নীনাকে নিয়ে আসে পিন্টিনিকোলাবল, মাঝে মাঝে আমাকেও নিয়ে যায় ওদের বাড়িতে।

এই একমাসে আমি ও নীনা পরস্পরের আরও কাছাকাছি এসেছি, উভয়ে উভয়কে গভীরভাবে ভালবেসেছি। পিন্টিনিকোলাবলও বোধ হয় বুঝতে পেরেছে যে, নীনার পক্ষে ওকে ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব। মনে নিশ্চয়ই প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছে ও, কিন্তু অতি সন্তর্পণে সে তা চেপে রেখেছে, বরং নীনা যাতে আনন্দে থাকে তার জন্য চেষ্টা করবার বিরাম নেই ওর। এমন কি নীনার অনুরোধে

তাকে চক্ররথটাও চালাতে দেয় সে, আমি আর নীনা মাঝে মাঝে চক্ররথে বহুদূর দুরান্তর ঘুরে আসি।

মাস খানেক পরে, আমার ক্যালেণ্ডার ঘড়ি অনুসারে মহাপাতালে আসবার প্রায় দেড় মাস পরে একদিন নীনা আর আমি দুপুরবেলা অশ্চলবলগলর বাড়িতে বসে গল্পগাছা করছি, এমন সময়ে গোলাপী আলোটা হঠাৎ নিভে গেল, চারদিক মহাপাতালের মহা অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে গেল। নীনা যে দিন পিন্টিনিকোলাবলর দেওয়া অলঙ্কারগুলো পরে এসেছিল, সেগুলো থেকে অন্ধকারে এক বিচিত্র ধরনের আলো ছড়িয়ে পড়ছিল। সে ভয় পেয়ে আমার গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল, তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলাম, আমার হাত চেপে ধরে নীনা বলল,—"হঠাৎ এমনভাবে সব আলো নিভে গেল কেন, অরবিন্দ?"

আমি বললাম,—"আমি নতুন এসেছি, আমি কি করে জানবো, কিন্তু তুমি তো অনেক দিন আগে এসেছ—"

সে আরও ঘন হয়ে দাঁড়িয়ে চুপি চুপি বলল,—"না, এমনটি কোনোদিন হয়নি, আমার কেমন ভয় করছে, মনে হচ্ছে কোনো একটা ভয়ঙ্কর অমঙ্গল ঘটবে।"

আমি তাকে ভরসা দিয়ে বললাম,—"না, না, অত ভয় পাবার কি আছে, হয় তো কোনো ব্রেকডাউন হয়েছে, একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে সব—"

নীনা কিন্তু আমার কথায় মোটেই ভরসা পেল না, বলল,—"মহাপাতালে তো কোনোদিন ব্রেকডাউন হতে পারে না, অরবিন্দ। পিন্টিনিকোলাবল বলেছে যে, মহাপাতালের ব্যবস্থাগুলো সব এমনই নিখুঁত যে, এখানে কোনো ব্রেকডাউন হবার সম্ভাবনাই নেই। এই যে মহাপাতালের আকাশে এত এত চক্ররথ উড়ছে, কোনোদিন কোনো অ্যাসকিডেন্টের কথা শুনেছ?"

আমি ভেবে দেখলাম যে নীনার কথাই ঠিক, এদেশের নিখুঁত ব্যবস্থায় ছন্দপতন ঘটে না কখনও।

এতক্ষণ ধরে অন্ধকারে থাকার ফলে অন্ধকারটা চোখে সয়ে গিয়েছিল, আমি নীনার মুখের, তার শরীরের অস্পষ্ট রেখা দেখতে পাচ্ছিলাম, আমার হাতে থাকা তার হাতের আঙুলের অংটিটা জ্বলজ্বল করছিল।

আমি বললাম,—"নীনা—"

"কী—"

"একটা কথা তোমাকে বলব, রাগ কোরো না কিন্তু—"

"তোমার ওপর রাগ করি এমন শক্তি কোথায়, অরবিন্দ—"

"পিন্টিনিকোলাবল তোমাকে সত্যিই ভালবাসে, নীনা, তার ভালবাসা একেবারে নিখাদ খাঁটি সোনা—"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল নীনা, শুধু আমার হাতের ওপর তার হাতখানা বার কয়েক কেঁপে উঠল, অন্ধকারে তার মুখ দেখা গেল না বটে কিন্তু আমি অনুভবে বুঝলাম যে, তার চোখে জল এসে গেছে। নীনা বলল,—"তা আমি জানি অরবিন্দ, আর তাই তো এত সুখের মাঝেও একটা দুঃখের কাঁটা আমার মনে বিঁধে আছে, তার প্রেমের প্রতিদান দেওয়া যে আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব—"

নীনার কথা শেষ হতে না হতেই যেমন হঠাৎ সব আলো নিভে গিয়েছিল তেমনি হঠাৎ জ্বলে উঠল, আমি দেখলাম যে, নীনার ঠোঁট দুটো থর থর করে কাঁপছে।

আমি কী যেন বলতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই ছুটতে ছুটতে ঘরে ঢুকলো অশ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলি। তারা পাশের ঘরে চলে গেল। মিনিট কয়েক পরে একটা বিচিত্র পোশাকে আপাদমস্তক মুড়ে আবার ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে গেল তারা। আমাদের সঙ্গে একটা কথাও বলল না, একবার দৃকপাতও করল না।

আমি ও নীনা ছুটে বাইরে গেলাম। দেখলাম, চক্ররথখানা অশ্চলবলগল ও বিম্বিলিবিলিকিলিকে নিয়ে বহুদূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তাদের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হল যে, কোথায় ভয়ঙ্কর একটা কিছু ঘটেছে, কিন্তু সেটা যে কী, তা আমরা দু'জনের একজনও অনুমান করতে পারলাম না।

ঘুরে ঘরে ঢুকতে যাব এমন সময়ে দূরে একটা চক্ররথকে ঝড়ের বেগে ছুটে আসতে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কয়েক মিনিটের মধ্যেই চক্ররথটা আমাদের দোরগোড়ায় এসে নামলো, লাফ দিয়ে নিচে নামলো পিন্টিনিকোলাবল।

এগিয়ে এসে আমার আর নীনার হাত দুটো তার বহুভাঁজ টেলিস্কোপিক হাত দিয়ে চেপে ধরে দ্রুতস্বরে বলল,—"নীনা, অরবিন্দ, ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটে গেছে—"

আমরা দু'জনে সমস্বরে বলে উঠলাম,—"কী, কী হয়েছে, পিন্টিনিকোলাবল? একটু আগে অশ্চলবলগল আর বিম্বিলিবিলিকিলিকে দেখলাম, বিচিত্র একটা পোশাক পরে তাড়াতাড়ি করে বেরিয়ে গেল—"

"হ্যাঁ, ওদের দু'জনের ডিউটি পড়েছে প্রসূতি আগারের ডিম-শিশুদের নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলার জায়গায়—"

"কিন্তু কেন?"

"গিণ্ডিয়াগোনাগুাপ্পারা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে—"

কথাটা শুনে আমরা দু'জনেই চমকে উঠলাম। এই যুদ্ধের কী ভয়ানক ফল হতে পারে, তা ভাবতে গিয়ে আমরা শরীরের রক্ত জল হয়ে গেল।

এক মুহূর্তে নীরব থেকে পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"আমার আর এক মুহূর্ত দেরী করা চলবে না, কখন ডাক পড়বে ঠিক নেই। আমাদের লাল আর হলদে ফৌজ এতক্ষণে সীমান্তে পৌঁছে গেছে। নীল-রোম বাহিনী মৃত্যু রশ্মি নিয়ে প্রস্তুত, মহানিয়ামক কেন্দ্রের নির্দেশ পাওয়া মাত্র তারা এগিয়ে যাবে,—তাই আমার সময় নেই মোটে—"

মিষ্টি সুরে নীনা বলল, "তুমি কি যুদ্ধে যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলে, পিন্টিনিকোলাবল?"

পিন্টিনিকোলাবলর ভাঁটার মতো দু'চোখে অনুরাগের অনির্বাণ শিখাটি দপ্ দপ্ করে জ্বলে উঠলো, এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল,—"না নীনা, আমি তোমাদের মুক্তি দিতে এসেছি—"

আমরা একসঙ্গে বলে উঠলাম—"মুক্তি!"

ধরা গলায় পিন্টিনিকোলাবল বলল,—"হ্যাঁ অরবিন্দ, মুক্তি। এই ভীষণ যুদ্ধে দু'পক্ষ থেকে যে সব মারাত্মক রশ্মি ব্যবহার করা হবে তাতে সিম্বিসিকোলাপ্টা আর গিণ্ডিয়াগোনাগুপ্পা এই দুটি মহাজাতিই ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমরা এখানে থাকলে—না না, নীনার কোনো ক্ষতি হোক সে আমি সইতে পারব না। অরবিন্দ, আমি জানি, নীনা তোমাকে ভালবাসে, আর তার সুখেই আমার সুখ। তোমরা দু'জন ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে যাও, বিয়ে করে সুখী হও, আমি তা হলে মৃত্যু মুহূর্তেও জানব যে, নীনা সুখী হয়েছে। এসো আমার সঙ্গে—"

আমাদের দু'জনকে টানতে টানতে বাইরে নিয়ে তার চক্ররথে নিয়ে তুলল পিন্টিনিকোলাবল। চক্ররথ ছেড়ে দিল।

মহাপাতালের ওপরতলার আকাশ দিয়ে ভূপৃষ্ঠে যাবার সুড়ঙ্গ পথের দিতে যেতে যেতে নিচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। নীলাভ আলোর কলকারখানাগুলো আর সবুজ আলোর বিজ্ঞানগারগুলো জনহীন। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। চক্রবালের কাছে অনেক আলোর মেলা। বুঝলাম যে, হলদে আর লাল-রোম সিম্বিলিকোলাপ্টারা সীমান্তে গিয়ে শত্রু-সৈন্যদের ধ্বংস করবার কাজে লেগে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ভূপৃষ্ঠে যাবার সুড়ঙ্গপথের কাছে গিয়ে নামলাম। পিন্টিনিকোলাবল লাফ দিয়ে চক্ররথ থেকে নেমে পড়ল, মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল,—"নীনা, তুমি তো চক্ররথ চালাতে জানো। সোজা ওপরে উঠে যাও, কোনো ভয় নেই,—বিদায়—"

হঠাৎ দিক্ চক্রবালে একটা বিরাট অগ্ন্যুদগার দেখতে পেলাম, তার তীব্র আলোতে চারিদিকে মসুদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠল পিন্টিনিকোলাবল, "নীনা, আর দেরী কোরো না—পালাও পালাও,—ওরা মস্তিষ্কের কোষধ্বংসী রশ্মি ব্যবহার করেছে—আর এক মুহূর্ত এখানে থাকলে তোমরা আর বাঁচবে না।"

অকস্মাৎ ব্যাকুল হয়ে নীনা বলল,—"কিন্তু তুমি? তুমি কী করে এখান থেকে ফিরে যাবে, পিন্টিনিকোলাবল? তুমি চলো আমাদের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠে—"

নীনার এই কথায় পিন্টিনিকোলাবলর চোখে জল এসে যায়, বারবার মাথা নেড়ে সে বলে,—"না না, তা হয় না নীনা, আমার দেশ, জাতি আজ মহাসঙ্কটে পড়েছে, এখান থেকে আমার যাওয়া আর হয় না। যদি এ যুদ্ধে আমরা জিততে পারি, তবে শান্তির সময়ে হয়তো কোনো দিন তোমাদের সুখের নীড়ে গিয়ে হানা দেব, কিন্তু আজ না,—তুমি পালাও নীনা, আমার জন্য ভেবো না। তুমি সুখে থেকো নীনা,—মাঝে মাঝে মহাপাতালের এই বন্ধুটিকে মনে কোরো,—বিদায়, নীনা বিদায়—"

হয়তো নীনার প্রস্তাবের প্রচণ্ড প্রলোভনের হাত এড়াবার জন্যই পুব দিকে এগিয়ে যেতে থাকে পিন্টিনিকোলাবল।

একটা নিঃশ্বাস ফেলে চক্রযানের সুইচ টিপে দেয় নীনা। হুশ্ করে সুড়ঙ্গ পথ বেয়ে তীব্র বেগে ওপরের দিকে উঠতে থাকে পিন্টিনিকোলাবলর চক্ররথ।

দেখতে দেখতে এতদিন ধরে বুকের ওপর চেপে বসা বায়ু-চাপের পাষাণভার লঘু হয়ে এল, এমন সময়ে নিচের দিকে আঙুল দিয়ে দেখাল নীনা।

আমি তাকিয়ে দেখলাম। মৃত্যু-কটাহে ছটফট করে পুড়ে মরা মহাসভ্য বিজ্ঞানদক্ষ সিম্বিসিকোলাপ্টা আর গিণ্ডিয়াগোনাগুপ্পাদের মৃত প্রাণগুলো যেন ঘন সবুজ বিষবাষ্পের মতো সমস্ত মহাপাতাল আচ্ছন্ন করে ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে।

আতঙ্কে শিউরে উঠে আমি দু'চোখ বুজে ফেললাম।

কতক্ষণ ধরে সুড়ঙ্গ পথের নীরন্ধ্র পথ বেয়ে ওপরে উঠছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ সুড়ঙ্গ ফুরিয়ে গেল আর নীনা চক্ররথটাকে সামলাতে না পারায় হিমালয়ের এক দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে ধাক্কা লেগে সেটা চুর্ণবিচুর্ণ হয়ে গেল। মাতা বসুমতী কোল পেতে আমাদের অচেতন দেহ দুটোকে তুলে নিলেন।

জ্ঞান ফিরে পেয়ে দেখলাম যে, নীনা আমার মাথার কাছে বসে নির্নিমেষ চোখে আমার মুখে তাকিয়ে আছে।

আমি উঠে বসলাম, দাঁড়াতে গেলাম, কিন্তু পারলাম না, এমন সময়ে দূরে দু'তিনজন পর্বতারোহী দেখতে পেলাম।

তারা ছিল স্যার জন হ্যামিল্টনের হিমালয়ান মাউণ্টেনীয়ারিং দল। তারা আমাদের তাদের বেস ক্যাম্পে নিয়ে গেল। তার পরের সব ঘটনা তো আপনাদের জানা।"

অরবিন্দ মজুমদার থামলেন। আমার পেন্সিলও থেমে গেল।

সোফায় হেলান দিয়ে আর একটা চুরুট ধরালেন অরবিন্দ মজুমদার।

আমি একটু ইতস্তত করে সবিনয়ে বললাম,—"একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করতে পারি কি?"

বাঁক হাসি হেসে অরবিন্দবাবু বললেন—"আগাগোড়া সমস্ত কাহিনীটাই তো ব্যক্তিগত পর্যায়ে পড়ে, তাই নয় কি, মকরন্দবাবু?"

"হ্যাঁ, তা বটে, তবু ... মানে—"

"আপনি কি জানতে চান তা আমি বুঝেছি। না নীনার সঙ্গে আমার বিয়ে আজও হয়নি। ও আশায় আছে যে, একদিন পিন্টিনিকোলাবল ভূপৃষ্ঠে ফিরে আসবে, তখন...কিন্তু তখন ও কী যে করবে তা ও নিজেই জানে না...হয়তো..."

আর কিছু বললেন না অরবিন্দ মজুমদার।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমি ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এলাম। আশ্চর্য মেয়েটিকে দেখবার জন্য এদিক ওদিক তাকালাম। কিন্তু দেখতে পেলাম না।

রাস্তায় পা দিয়ে অরবিন্দবাবুর প্রাসাদোপম বাড়িটার দিকে আর একবার তাকালাম। এতক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের মতো অরবিন্দবাবুর গম্ভীর ভরাট কণ্ঠস্বর শুনছিলাম বলে অন্য কিছু ভাববার অবকাশ পাইনি, কিন্তু এখন চিরপরিচিত কোলকাতার বাস-ট্রাম-ট্যাকসি চিহ্নিত রাজপথে দাঁড়িয়ে হঠাৎ সমস্ত কাহিনীটাই কেমন যেন অলীক, অবাস্তব বলে মনে হল। ■ (পুনর্মুদ্রণ, 'আশ্চর্য!', জুলাই, ১৯৬৫)

ভালোবাসার দুঃখ

নবকুমার ঘোষ

কুংফু খুব নরম মনের মানুষ। বর্তমান পৃথিবীতে নরম মনের মানুষদের খুব-ই অসুবিধা। নরম মনের মানুষেরা এখন গালাগালের পর্যায়ে পড়ে।

কংফু পৃথিবীর হোমোস্যাপিয়েন্স ল্যাবের একজন নামকরা জেনেটিক ইঞ্জিনীয়ার। এত কিছু থাকা সত্ত্বেও কংফু কিন্তু একদম একা। এখন পৃথিবীতে কেউ কাউকে আত্মীয় বলে মনে করে না। কাকা, দাদা, মা, বাবা—এ সব প্রাচীন সম্পর্কগুলো এখন নিঃশেষ হয়ে গেছে। মানুষের পদবী কবেই অবলুপ্ত হয়ে গেছে। মানুষ এখন ভীষণ একা। সরকার নামক একটা মূক বধির প্রতিষ্ঠান সমগ্র পৃথিবীকে পরিচালনা করেন। কিছু উন্নত মস্তিষ্কের কম্প্যুটর এখন মানুষের প্রকৃত ভাগ্য নিয়ন্ত্রা।

শূন্যে ভাসমান একটা সুউচ্চ বাড়ির দশ তলার একটা সুন্দর ফ্ল্যাটে এতক্ষণ বসেছিল কংফু। এই বাড়িগুলো মাধ্যাকর্ষণ শক্তি রহিত। তাই শূন্যে ভেসে বেড়ায়। কংফুর সামনে একটা মনো টেলিফোন চেম্বার। টেলিফোনের নিচে একটা অস্বচ্ছ পর্দা। কংফু টেলিফোনের সামনে এসে কিছু নম্বরের বোতামে আঙুল ছোঁয়ালো। একটু পরেই সুমিষ্ট পাখির ডাকে টেলিফোন সাড়া দিল। কংফু নিচে পর্দার দিকে তাকাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘষা কাঁচের পর্দা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলোয়। একটু পরেই টেলিফোন থেকে একটা ধাতব কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

বলুন? অনুসন্ধান।

কংফু বলল, প্রকৃতিকে চাই।

প্রকৃতি সম্পর্কে ডিটেলস বলুন?

মাঝারী সাইজের দীঘল চেহারা। গভীর কালো দুটো চোখ। সুন্দর মুখ। মাথায় সোনালী চুলের বাহার। চিকিৎসা দপ্তরের নিউরো সার্জন। যন্ত্র কিছুক্ষণ চুপচাপ রইল। একটু পরে, মনো টেলিফোনের অস্বচ্ছ পর্দা উদ্ভাসিত হয়ে উঠল আলোয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পর্দায় একটা অস্পষ্ট মেয়ের ছবি ভেসে উঠল।

যন্ত্র বলল, প্রকৃতির কথা চিন্তা করুন। প্রকৃতির কথা ভাবুন।

কংফু মনে মনে প্রকৃতির কথা ভাবতে লাগল।

পর্দার ছবিটা এখন লাফাতে লাফাতে কাঁপতে শুরু করেছে।

আরো চিন্তা করুন, আরো ভাবুন।

কংফু প্রাণপণে প্রকৃতির কথা ভাবতে লাগল।

পর্দার ছবিটা এবারে স্থির হয়ে গেছে। কংফু দেখল, ছবির পর্দায় প্রকৃতি ছড়িয়ে আছে। ওর পরনে লাল রঙের স্বর্ণ তন্তুর একটা টিউনিক।

যন্ত্র বলল, কথা বলুন।

কংফু বলল, হ্যালো প্রকৃতি, কেমন আছো?

ভালো নয়। বড় এক ঘেয়েমি। গত পাঁচ বছর কেউ ডাকেনি আমায়। বড় একা লাগে। তুমি কেমন?

গতানুগতিক। কোন কিছু ভালো লাগছে না। মন বসাতে পারছি না।

চলো, একবার এক্সকারসান করে আসি।

এক্সকারসান। ফ্যানটাসটিক! তুমি হোমে থাকো। আমি এখুনি আসছি।

মিনিট পনের পরে একটা পাখির সুমিষ্ট স্বরে ডোরবেল বেজে উঠল। কংফুর দরজার ফ্রেমে ভেসে উঠল প্রকৃতির একটা দ্বিমাত্রিক ছবি। যন্ত্র ছবিটাকে ভালো করে দেখে প্রকৃতির শরীরে তখন শোধন রশ্মি ফেলে ওকে জীবাণুমুক্ত করল।

দরজা খুলে গেল একটু পরেই।

এখনকার অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে দরজা বা জানলা বলে কোন বস্তু নেই। শুধু দেওয়ালের নির্দিষ্ট জায়গায় জমাট বাঁধা বাতাসের আস্তরণ। বাইরের কোন প্রাণী বা জীবাণু বাতাসের এই আস্তরণ ভেদ করে ভেতরে ঢুকতে পারবে না।

ঘরে প্রবেশ করে একটা জমাট বাঁধা আলোর চেয়ারে বসল প্রকৃতি। কংফু তাকিয়ে দেখল, প্রকৃতির চোখ দুটো খুব করুণ। মুখখানা বড় মায়াময়।

জিজ্ঞেস করল, ব্রেকফাস্ট করেছ?

না।

ভালো লাগছে না?

না।

শরীর খারাপ নাকি? চলো একবার ক্লিনিকে। পাকস্থলীটা দেখাতে হবে।

প্রকৃতি কোন কথা বলল না। কিরকম এক আপন ভঙ্গিতে সে বসে রইল জমাট বাঁধা আলোর চেয়ারটায়।

কংফু এবার প্রকৃতিকে নিয়ে পাশের ঘরে গেল। কংফুর মতন দায়িত্বশীল মানুষদের হোমে এখন একটা করে ক্লিনিক্যাল চেম্বার থাকে। ছোটখাটো পরীক্ষা-নিরীক্ষাগুলো সব এখানেই হয়ে যায়।

কংফু প্রকৃতিকে নিয়ে ক্লিনিক্যাল চেম্বারে প্রবেশ করল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই যন্ত্র প্রকৃতির চিকিৎসা শুরু করে দিল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে প্রকৃতির রক্তের চাপ, হার্ট বিট, সুগার এবং অ্যামোনিয়া পজিশন কম্প্যুটর স্ক্রিনে দেখা যেতে লাগল।

খুব ভালো করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে যন্ত্র জানালো, প্রকৃতির পাকস্থলীতে খাদ্য পরিপাক জারক রস ঠিকমত নিঃসৃত হচ্ছে না। পাকস্থলীটা খারাপ হয়ে গেছে। পাল্টাতে হবে। তাহলেই ক্ষিদে বাড়বে।

মাত্র দশ মিনিটের মাথায় যন্ত্র প্রকৃতির পাকস্থলী চেঞ্জ করে একটা নতুন পাকস্থলী লাগিয়ে দিল। এক গাদা ক্ষিদে নিয়ে প্রকৃতি তার শয্যায় উঠে বসল।

কংফুর দিকে তাকিয়ে হাসলো প্রকৃতি।

কংফুও হাসি ফিরিয়ে দিল।

ভীষণ ক্ষিদে পেয়েছে, ডাইনিংরুমে চল।

কংফু নির্দ্বিধায় প্রকৃতিকে নিয়ে ডাইনিংরুমে নেমে এল।

ডাইনিং স্পেসটা বেশ বড়। খুব খোলামেলা। মাঝখানে একটা টেবিল ঘিরে খান কয়েক চেয়ার। টেবিলের নিচে একটা সুইচ বোর্ড। তারই কয়েকটা সুইচে আঙুল ছোঁয়ালো কংফু।

পরোক্ষ চালিত একটা ট্রলি এগিয়ে এল টেবিলের সামনে। ট্রলির উপর থরে থরে সাজানো সমুদ্র শ্যাওলার স্যালাড, সামুদ্রিক উদ্ভিদের ভেজিটেবল, তিমির দুধের বার, আরমাডিলার বারবিকিউ--আরো কত খাবার।

কংফু আরমাডিলার একটা বারবিকিউ তুলে নিল।

প্রকৃতি সবগুলো থেকে দু-একটা পিস তুলে নিয়ে সাগ্রহে খেতে লাগল।

অবশেষে যন্ত্র দিয়ে গেল মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবসের কালো কফি।

খুব তারিয়ে তারিয়ে কফিটা খেল ওরা দু'জনে।

খাওয়া হয়ে গেলে দু'জনে বেরিয়ে এল ডাইনিংরুম থেকে।

এই বাড়িটার ছাদে গোটা কয়েক ভার্টিক্যাল রকেট দক্ষিণমুখো করে দাঁড় করানো রয়েছে। তারই একটাতে ওরা চড়ে বসে সোজা উড়ে চলল দক্ষিণ দিকে। প্রশান্ত মহাসাগরের জলের গভীরে অত্যাধুনিক শহর ইডেন। আধুনিক প্রযুক্তির সব ক'টি উপাদানই এই শহরে আছে। কংফু তার রকেট থেকে একটা বাতাস ভেলা বার করে তাতে চেপে বসল। বাতাস ভেলা ওদের দু'জনকে নিয়ে ডুব দিল প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরে।

সূর্য থেকে তাপ আর আলো সংগ্রহ করে এই শহর পরিচালিত হয়। ইডেনের মাঝখানে একটা সুদৃশ্য সাদা রঙের অট্টালিকা। অট্টালিকাটি আগাগোড়া দুর্মূল্য মুনস্টোনে তৈরি।

প্রকৃতিকে নিয়ে কংফু সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করল।

অট্টালিকাটার নাম ভেনাস। ভেনাসে পৃথিবীর সব দেশেরই কিছু কিছু মানুষ রয়েছে। তবে, কেউ কোন কথা বলছে না। একে অপরকে দেখে আহ্বান জানাচ্ছে না। এদের দেখে মনে হয়, মানুষকে যেন বোবায় ধরেছে।

ভেনাসের গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা বিরাট কমন স্পেস। সেখানে থরে থরে চেয়ার আর টেবিল সাজানো। চেয়ারগুলো সবই ভর্তি। ডানদিকের দেওয়াল ফ্রেমে দুটো চেয়ার খালি হতেই কংফু প্রকৃতিকে নিয়ে সেখানে গিয়ে বসল। টেবিলের ওপর খাদ্য তালিকা পড়ে রয়েছে। সারা পৃথিবীর খাদ্যের সম্ভার সাজিয়ে তালিকাটা যেন ওদের আহ্বান জানাচ্ছিল।

আফ্রিকার এক উপজাতির একটা খাদ্যে দাগ দিয়ে কংফু যন্ত্রের সুইচে আঙুল ছোঁওয়ালো। প্রকৃতি কিছু বলছিল না। সে চারদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। একটা পরোক্ষ চালিত ট্রলি কংফুদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসতে ওরা দেখল, ট্রলির উপর ধূমায়িত খাবার। উগালী, সাদা সাদা উইপোকার সঙ্গে আরো নানারকম পতঙ্গের প্রিপারেশন। কংফু দুটো ডিম তুলে নিয়ে একটা তারিয়ে খেল। প্রকৃতি কিন্তু খুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও খেল।

কোণের দিকের একটা চেয়ারে একজনকে দেখে কংফু চমকে উঠল। কোথায় যেন দেখেছে বলে মনে হল মানুষটাকে। কিন্তু এখন ভালো করে তাকিয়ে মানুষটাকে চিনতে পারল না সে।

প্রকৃতির পাশের চেয়ারটা খালি। সেখানে একজন ক্যানাডিয়ান যুবক এসে বসতেই প্রকৃতি মিষ্টি হাসিতে তাকে আহ্বান জানালো। যুবকটির চোখে চশমা। সে প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে তাকে যেন দৃষ্টি দিয়ে চাটতে লাগল। কংফু কিছু মনে করল না। এ সব এখন খুবই সাধারণ ব্যাপার। মানুষের ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলতে এখন আর কিছু নেই।

পেছনের সিট থেকে একটা মেয়ে কংফুর দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসল। কংফু মেয়েটাকে পাত্তা দিল না। তখন মেয়েটি জুগল নামে একজন আফ্রিকান যুবকের কণ্ঠলগ্না হয়ে ঢুকে গেল তিন নম্বরে স্যুইটে।

প্রকৃতির পাশে বসে থাকা কানাডিয়ান যুবকটি হঠাৎ প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরে সবার সামনেই সশব্দে একটা চুমু খেল। কংফু সেদিকে তাকিয়ে দেখল শুধু। ওর মনটা তখন বিষাদে ভরে গেল। আসলে, কংফু নরম মনের মানুষ। তাই প্রাচীন পৃথিবীর বেশ কিছু সেন্টিমেন্টকে সে মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি। প্রকৃতি তার একান্ত নিজস্ব নারী। সেখানে অন্য পুরুষের প্রবেশাধিকার দেখলে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না।

যুবকটি প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরে একটা স্যুইটের মধ্যে ঢুকে গেল। কংফু দুর্দান্ত কি সব ভাবল। তারপর এক মুহূর্ত দেরী না করে সে সশব্দে স্যুইটের দরজায় লাথি মারতে লাগল। এক সময় স্যুইটের দরজা ভেঙে গেল। কংফু নেশাগ্রস্ত একটা দানবের মতন সেই স্যুইটে প্রবেশ করে প্রকৃতির থেকে সেই যুবকটিকে আলাদা করল। তারপর একটা প্রবল ঘুষিতে যুবকটিকে মাটিতে ফেলে দিয়ে তার বুকের উপর চেপে বসে গলা টিপে ধরল। যুবকটির চোখ বেরিয়ে এসেছে। মুখ দিয়ে একটা অব্যক্ত শব্দ করে সে ঢলে পড়ল মাটিতে।

যুবকটিকে খুন করে কংফু এবারে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করল। তারপর এক ঝটকায় প্রকৃতিকে বুকে তুলে নিয়ে বাইরে আসতেই গোটা পাঁচেক রোবোট মানুষ কংফুকে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওদের সংরক্ষিত গাড়িতে। গাড়িটা এখন ইডেন ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে পৃথিবীর পথে।

পৃথিবীর উপর মগজ হোমোনকুলাস কংফুর এই স্বেচ্ছাচারিতা মেনে নিতে পারেননি। তিনি কংফুকে শাস্তিবিধান করেছেন। ব্রেন অল্টারনেশন।

কংফু ব্রেন অল্টারনেশনকে খুব ভয় পায়। সে জানে, কোন মানুষের আকৃতিতে বেঁচে থাকলেও সে সারাজীবন জীবন্মৃত হয়ে থাকে। গত বছরের ঘটনাটা এখনো তার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে। সাত নম্বর সেকটরের টেডি মহম্মদের ব্রেন অল্টারনেশন হয়েছিল। ব্রেন অল্টারনেশনের পর তাকে একটা বিশেষ রকেটে করে নিয়ে গিয়ে রকেট থেকে মহাশূন্যে ফেলে দেওয়া হয়। রকেট থেকে মহাশূন্যে ফেলে দিতেই টেডি মহম্মদের শরীরটা জমে বরফ হয়ে যায়। তারপর মহাশূন্যে ভাসতে ভাসতে চিরতরে হারিয়ে যায় কালের গর্ভে।

কংফু এখন বসে আছে তার একটি সেটে। এখন রাত্রিবেলা। আলাদা একটা কৃত্রিম উপগ্রহ থেকে আলো ঝরে পড়ছে। উপগ্রহের আলোয় সারা জায়গাটা আলোকিত।

প্রকৃতির কথা মনে পড়ছে কংফুর। ওকে ভালবাসার জন্যই কংফুর আজ বিড়ম্বনা। না জানি, সে কোথায় আছে। হোমোনকুলাস তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে কি না, সেটাও তার অজানা। প্রকৃতির কোন সংবাদ দিতে পারবে না সে। চিরদিনের জন্য প্রকৃতি, একটা ফুলের মতো মেয়ে, তার কাছ থেকে হারিয়ে গেল।

কংফুর চোখ দুটো জলে ভরে আসছিল। চোখের জল কিংবা কারুর জনও মন খারাপ করা—এ সব ব্যাপারগুলো বর্তমান পৃথিবীতে অপরাধযোগ্য। কংফু সাবধানে চোখের জল মুছে নিজেকে শক্ত করল। হোমোনকুলাস পুরনো পৃথিবীর সেন্টিমেন্টগুলোকে একে একে ধ্বংস করে দিচ্ছেন।

অনেকক্ষণ বসেছিল কংফু। ওর কিছু ভালো লাগছিল না। এমন সময় ওর সামনে মনো টেলিফোন পাখির কাকলীতে মুখরিত হয়ে উঠল। সে ধড়ফড় করে উঠে টেলিফোনের স্যুইচ অন করল। মনো টেলিফোনের নিচে টিভির পর্দা। উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে আলোয়। একটু পরেই সেখানে ভেসে উঠল হোমোনকুলাসের ছবি।

কংফু তাকিয়ে আছে।

ধন্যবাদ কংফু।

ধন্যবাদ স্যার।

পৃথিবীর উন্নত মগজেরা তোমার কাজের গুরুত্ব এবং তোমার দায়িত্বশীলতা বুঝে তোমাকে বেঁচে থাকার একটা সুযোগ দিচ্ছে। তোমাকে মহাকাশে প্রেরণ করা হবে। সেখান থেকে যদি ফিরে আস, তবে তোমার শাস্তি মার্জনা করা হবে।

একটু থেমে হোমোনকুলাস আবার বলতে থাকলেন, প্রকৃতিকে আমরা টাইটানে পাঠিয়ে দিয়েছি। সেখানে সে মিশনারিজ অফ হেভেনে যোগদান করেছে। কাল সকালে কয়েকজন রোবোটকে পাঠাবো। আশা করি, প্রস্তুত থাকবে। ধন্যবাদ।

কংফু অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ধন্যবাদ।

আজ সকালে কয়েকজন রোবোট এসে কংফুকে একটা ভারটিক্যাল রকেটে বসিয়ে মহাকাশে উড়িয়ে দিল। রকেটটা খুব ছোট। ইঞ্জিনের যন্ত্রপাতিই বেশি। তাছাড়া আছে একটি মাত্র ঘর। আর একটা বড় রকমের জায়গা। খাবার জিনিস রাখার কোন ব্যবস্থা নেই।

রকেটটা পৃথিবী থেকেই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছিল। রকেট এখন কত মাইল গতিতে যাচ্ছে, কংফু জানে না। মহাকাশে, মহাশূন্যে কিছুই দেখা যায় না। মাঝে মাঝে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একেবারে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তখন কংফুর ভয় হয়, সে হঠাৎ কোন গ্রহতে ধাক্কা লেগে একেবারে সবশুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু কংফুর কিছু করবারও জো নেই। সে দু-একবার রকেটটার নানা বোতাম টিপে দেখেছে। কিন্তু তাতে রকেটের দিক বা গতির কোন হেরফের হয়নি। রকেটটাই বা এভাবে কতদিন চলবে? এক সময় নিশ্চয়ই এর জ্বালানী ফুরিয়ে যাবে। তখন কি হবে। কংফু আর ভাবতে পারে না।

এখন কিছুই করবার নেই বলে সে নিরাশভাবে চোখ বুজে বসে রইল। একটু বাদেই ঘুম এসে গেল তার।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে সে জানে না। হঠাৎ একটা মন মাতানো গন্ধে তার ঘুম ভেঙে গেল। একটা গোলাপী রঙের গ্রহের পাশ দিয়ে কংফুর রকেট তখন উড়ে যাচ্ছিল। সে হঠাৎ দেখল, সেই গ্রহটা থেকে একটা লাল রঙের সুতো ছুটে আসছে। ঠিক গুলি সুতোর মত পাতলা। সেই সুতোটা তার রকেটে লাগতেই কংফুর রকেট গতি হারিয়ে ধীরে ধীরে নেমে এল সেই গোলাপী গ্রহের বুকে।

গোলাপী গ্রহের বুকে রকেট নামতেই হঠাৎই রকেটের দরজা খুলে গেল আপনা-আপনি।

মাত্র পাঁচজন প্রাণী দাঁড়িয়ে আছে দরজার সামনে। তাদের আগে যেন কোথায় দেখেছে কংফু। সে অবাক হয়ে দেখল, মহাভারতের চরিত্রগুলো যেন টিভির পর্দা থেকে উঠে এসে দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে।

যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল আর সহদেব। কারুরই মাথায় চুল দেখা যাচ্ছে না, প্রত্যেকের মাথাতেই সোনার মুকুট। গায়ে বহুমূল্য পোশাক, কানে স্বর্ণকেয়ুর, গলায় হার, হাতে সোনার বাজু বন্ধ, তাগা, প্রভৃতি। প্রত্যেকের যোদ্ধার বেশ। প্রত্যেকের পরনেই দামী কাপড়। তবে সেটা সুতোর নয়। অয়েল ক্লথের মত জিনিসের চকচকে পোশাক। প্রত্যেকের হাতেই ত্রিশূলের মত দেখতে একটা করে অস্ত্র।

কেউ কোন কথা বলার আগেই সহদেব তার ত্রিশূল থেকে খানিকটা আলো ছুঁড়লো। তাতেই ইলেকট্রিক শব্দ খাওয়ার মতন যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল কংফু। সে বুঝলো, ওরা প্রথমেই তাকে জানিয়ে দিতে চায় ওদের কাছে কিরকম অস্ত্র আছে। এখনো অর্জুন কিংবা ভীমের অস্ত্রের জোর টের পায়নি কংফু।

সে হাত দুটো সামনে এগিয়ে ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে এক পা এক পা করে রকেট থেকে নেমে এল নিচে।

তখন ভীম দুর্বোধ্য ভাষায় বকুনি দিয়ে এবার সে তার অস্ত্র থেকে কি যেন ছুঁড়লো। কংফুর পায়ের কাছে একটা বেশ বড় আকারের পাথরের খণ্ড পড়েছিল। মুহূর্তে সেটা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সেখান থেকে। ভীম তার অস্ত্র থেকে বাতাসের গোলা ছুঁড়ছে। কংফু যন্ত্রণায় ডিগবাজি খেতে লাগল। এরা যদি সবাই মিলে এক সঙ্গে অস্ত্র চালনা করে, কংফু তাহলে সঙ্গে সঙ্গে মরে যাবে।

কংফু এবারে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য ডিফেনসিভ খেলতে লাগল। না, এভাবে মার খেতে সে আসেনি। একটু এগিয়ে গিয়ে সে নকুলকে লক্ষ্য করে লাথি আর ঘুষি চালালো । কি আশ্চর্য! কংফুর আঘাত ওর শরীর ভেদ করে চলে গেল। মানুষটার কিছুই হল না, বাতাসের শরীর যেন।

কংফু বুঝতে পারলো, এ লড়াইতে তাকে হেরে যেতে হবেই। এর মধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

এই সময় আকাশে একটা শব্দ শোনা গেল। তারপর শোনা গেল একটা সুমিষ্ট বাঁশির সুর। বাঁশির সুর শুনে মানুষগুলো তাদের অস্ত্র সম্বরণ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়ালো।

কংফু দেখল আকাশ থেকে আলোর রথ নেমে আসছে। আর সেই রথে বসে রয়েছে টিভিতে দেখা বি আর চোপড়ার মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণের হাতে কোন বাঁশি নেই। সে মুখ দিয়ে একটা শব্দ করছে। আর সেটাই বাঁশির মতন শোনাচ্ছে।

বাঁশির শব্দ থামিয়ে কৃষ্ণ এবারে রথ থেকে নেমে এল। মাটিতে নেমে সে একটা অন্যরকম অদ্ভুত চিৎকার করতেই এই মানুষগুলো সবাই বসে পড়ল মাটিতে। তাদের অস্ত্রগুলো পাশে নামিয়ে রাখল।

কৃষ্ণ মাটিতে বসে খুব মিষ্টি গলায় কি যেন বলল কংফুকে। কিন্তু সে এক বর্ণও বুঝতে পারল না।

কংফু এবারে হাত নেড়ে জানালো, সে এদের ভাষা জানে না।

কংফুর মাথা নাড়া দেখেই কৃষ্ণ মাটিতে দু-হাত ঠেকালো। তার দেখাদেখি অন্য আর সবাই তাই করল। তারপর সে হাত তুলে কি যেন হুকুম করল।

নকুল ছুটে গেল সেই আলোর রথের দিকে। তারপর রথ থেকে দুটো সোনার গোল বল নিয়ে ফিরে এল। একটা দিল কৃষ্ণের হাতে, আর একটা নিয়ে এল কংফুর দিকে।

কংফু সেই বলটা হাতে নিয়ে এখন বসে আছে।

কৃষ্ণ সেই বলটা মুখের কাছে নিয়ে পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলল, কংফু, তুমি এই জিনিসটা মুখের কাছে ধরলেই তোমার ভাষা আমরা বুঝতে পারবো। তুমিও আমাদের ভাষা বুঝতে পারবে।

বাংলা কথা শুনে খুব রোমাঞ্চ হচ্ছিল কংফুর। কতকাল পরে সে বাংলা শুনলো। তাই সে আর কোন দ্বিধা না করে সেটা তুলে নিল হাতে । কি অদ্ভুত যন্ত্র বানিয়েছে এরা। এর থেকে শব্দ তরঙ্গ বেরিয়ে অন্য লোকের গায়ে ধাক্কা মারলেই তা সঙ্গে সঙ্গে অনূদিত হয়ে যাচ্ছে।

কংফু সেটা মুখের কাছে এনে বলল, আপনারা কে? আমাকে আক্রমণ করলেন কেন?

কৃষ্ণ বলল, আমরা গোলাপ গ্রহের অধিবাসী। আমাদের সূর্যের নাম, ব্রায়ারিয়াস ডেল্টা। আমরা কোন বিদেশীকে সহ্য করতে পারি না। কোন বিদেশী দেখলেই আমরা আক্রমণ করে তাকে বন্দী করি। তোমার পরিচয় বল?

কংফু বলল, আমি পৃথিবীর মানুষ। ঘটনাচক্রে আমি আপনাদের গ্রহে এসে পড়েছি।

পৃথিবীর মানুষ! দাঁড়াও, দাঁড়াও। তোমাদের সূর্য তো মহাকাশের সব চেয়ে ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক। তিন নম্বর মিল্কিওয়েতে তোমাদের পৃথিবী, আরো ন'টা গ্রহ নিয়ে সূর্যের চারপাশে ভেসে বেড়াচ্ছে।

কংফু কোন কথা বলল না। সে তাকিয়ে রইল। এই সুন্দর গোলাপ গ্রহটির দিকে । অসংখ্য পাহাড় দেখা যাচ্ছে। আর হালকা হালকা কমলা রঙের মেঘ। তবে কোন উদ্ভিদ নেই।

কৃষ্ণ নামে মানুষটি হঠাৎ অর্জুনের দিকে তাকিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় কি একটা নির্দেশ দিল।

অর্জুন কৃষ্ণের রথের মধ্যে প্রবেশ করে একটা সিনেমা প্রজেকটরের মতন যন্ত্র নিয়ে এল। যন্ত্রটা চালু করতেই দেখা গেল, যন্ত্রের মুখ থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ বেরিয়ে এসে আকাশে জমা হতে লাগল। দেখতে দেখতে এক বিরাট মেঘ পুঞ্জে সারা আকাশ ঢেকে গেল।

কৃষ্ণ এবারে সেই যন্ত্রটার একটা সুইচ টিপলো। আর কংফু অবাক হয়ে দেখতে লাগল। সেই জমে থাকা মেঘের বুকে পৃথিবীর ছবি ফুটে উঠেছে। পৃথিবীর খুব দুর্দিন। হোমোনকুলাসের স্বেচ্ছাচারিতা অনেক বেড়ে গেছে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে সে দাস বানিয়ে ফেলেছে। অধ্যাপক ইউনুস হোমোনকুলাসের স্বেচ্ছাচারিতা সহ্য করতে না পেরে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। প্রফেসরের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন পৃথিবীর বেশির ভাগ মানুষ। অধ্যাপক বেশির ভাগ কম্প্যুটরগুলোকে অকেজো করে দিয়েছেন। বিরাট এক মানুষের মিছিল নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন হোমোনকুলাস-এর দিকে।

হোমোনকুলাস প্রথমটায় হতচকিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা বুঝতে পেরেই সে তার চারপাশে খুব দ্রুত একটা বিরুদ্ধ চৌম্বক আবেশ গড়ে তুলল।

কয়েকজন মানুষ হোমোনকুলাসকে দেখতে পেয়ে ধরতে গিয়েই সেই অভ্যন্তরীণ ব্যাপারটা ঘটল। মানুষগুলো হোমোনকুলাসকে ধরতে গিয়েই বিরুদ্ধ চৌম্বক আবেশের ধাক্কায় ছিটকে পড়ল মাটিতে। অনেকের হাত পা ভেঙে গেল।

অধ্যাপক ইউনুস এবারে তাঁর নিউরো রশ্মির আটোমেটিক পিস্তল থেকে অগ্নি বৃষ্টি করতে শুরু করলেন।

হোমোনকুলাসের সারা শরীরে আগুন ধরে গেল। ধাতব দেহ গলে গলে পড়তে লাগল মাটিতে। প্রফেসর ক্রমাগত তাঁর পিস্তল থেকে অগ্নি বৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। দেখতে দেখতে হোমোনকুলাসের দেহ মিলিয়ে যেতে লাগল বাতাসে। এক সময় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল হোমোনকুলাস।

হোমোনকুলাস নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতেই মানুষগুলো বাঁধ ভাঙা নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত নৃত্য করল। অনেকদিন পরে প্রাচীন পৃথিবীর রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে তারা।

আস্তে আস্তে পৃথিবী মিলিয়ে গেল মেঘের গা থেকে।

ছবিটা মিলিয়ে যেতেই কংফু অস্থির হয়ে উঠল। পৃথিবীর প্রতি এক অমোঘ আকর্ষণে সে ছটফট করতে লাগল।

কৃষ্ণ বললেন, পৃথিবী ডাকছে তোমাকে। তুমি ফিরে যাও কংফু। কংফুর মুখে হাসি। সে তখন হেঁটে চলেছে তার রকেটের দিকে।

পৃথিবীতে পৌঁছে কংফু অবাক হয়ে গেল।

মানুষের বিরাট মিছিল পরিচালনা করে অধ্যাপক ইউনুস এগিয়ে আসছেন তাকে অভিবাদন জানাতে। মিছিলে প্রকৃতি রয়েছে। তার হাতে একটা ফুলের মালা। গলায় রবীন্দ্র গান।

প্রকৃতি এগিয়ে এসে কংফুর গলায় ফুলের মালা পরিয়ে দিল।

বিজয় মাল্য। না, বর মাল্য, কংফু তা জানে না। ■

অন্ধকারের রোদ

কেয়া বর্ধন

শুনেছি শুনেছি পাতালে নাকি
রোদ ওঠে ভীষণ অন্ধকারে...
পাতাল লোকের ছায়ামায়া
ফুটে ওঠে চোখের 'পরে...
তাই যদি হয়, বন্ধু আমার...
এনে দাও সেই অন্ধকার...
মর্ত্যলোকের কায়াহীনদের
দেখতে যেন পাই একবার!

বিচিত্র খবর

বিছানার মতো বড় বই!

বইটা লম্বায় সাত ফুট, চওড়ায় পাঁচ ফুট—তার ওপর লম্বা হয়ে ঘুমিয়ে পড়া যায়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১১২ কিন্তু সব কাগজ বিছিয়ে দিয়ে একটা ফুটবল মাঠ ঢেকে ফেলা যায়। ডিজিটাল প্রিন্টিংয়ে কত বড় আর কত সুন্দর ছবি-টবি ছাপা যায়, তা দেখেছিলেন ম্যাসাচুসেটস-এর এক বৈজ্ঞানিক—ভুটানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তুলে ধরলেন মলাট থেকে মলাটের মধ্যে—দাম ধরলেন মাত্র সাড়ে পাঁচ লাখ টাকা।

(সংবাদ উৎস : ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট নিউজলেটার)

●

বিরাট সংখ্যার নানা নাম

হিন্দুরা বিরাট সংখ্যার নানা নামকরণ করেছেন। যজুর্বেদ সংহিতায় আছে : এক (১), দশ (১০), শত (১০০), সহস্র (১,০০০), অযুত (১০,০০০), নিযুত (১০০,০০০), প্রযুত (১,০০০,০০০), অর্বুদ (১০,০০০,০০০), নার্বুদ (১০০,০০০,০০০), সমুদ্র (১,০০০,০০০,০০০), মধ্য (১০,০০০,০০০,০০০), পরার্ধ (১,০০০,০০০,০০০,০০০)। এছাড়াও, মহাপদ্ম (১ লক্ষ কোটি), শঙ্খ (লক্ষ কোটি), নিখর্ব (অযুত কোটি), পদ্ম (শত নিখব বা দশ শঙ্খ) [বঙ্গীয় শব্দকোষ]

বিভিন্ন আর এইরকম বিরাট সংখ্যার নামকরণ আর কোনও প্রাচীন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না।

যে জগতে সূর্য নেই

অসীম বর্ধন

জ্যাকুয়া-জাইভ্‌স কোস্তু যিনি 'দি সাইলেন্ট ওয়ার্ল্ড' ফিল্মখানি তুলে অ্যাকাডেমী পুরস্কার পেয়েছিলেন, তিনি ১৯৬৪ সালে আর একখানি তেমনি বিস্ময়কর রঙিন ফিল্ম করেছেন কলম্বিয়া থেকে, নাম 'ওয়ার্ল্ড উইদাউট সান'। ছবিখানি তোলা হয়েছে লোহিত সাগরের তলায়। কোস্তু নিজে ছবিটিতে অভিনয় করেছেন। ছবিতে একটা অদ্ভুত গড়নের ডুবো জাহাজ আছে, সেটা কোস্তু-র ডিজাইন। আর আছে বিচিত্রদর্শন ডুবুরীরা। সাগরের নিচে ঘরবাড়ির ডিজাইনগুলিও কোস্তু করেছেন। তাঁরা একটি মাস জলের তলায় ছিলেন, কত ভয়ঙ্কর বিপদের সম্মুখীন হয়ে কাজ করতে হয়েছে, হাতিয়ার ছিল শুধু ক্যামেরা আর সাহস।

স্টুডিওর মধ্যে সাজানো কোনো শট তোলাই হয়নি, কোনো রকম নকল কলাকৌশলও প্রয়োগ করা হয়নি।

লোহিত সাগর ছাড়া ভারত মহাসাগরেও কিছু কিছু ছবি নিতে হয়েছে। সমুদ্রচারী বিজ্ঞানীরা কতরকমের বৈজ্ঞানিক এক্‌সপেরিমেন্টের বিস্ময়কর ঘটনার সম্মুখীন হয়েছেন, তারই চমকপ্রদ কাহিনী এতে চিত্রায়িত হয়েছে।

সমুদ্র বিজ্ঞানী হিসেবে কোস্তু অনেকদিন থেকেই খ্যাতি লাভ করেছেন। তাঁর 'দি সাইলেন্ট ওয়ার্ল্ড' ফিল্মখানি যে শুধু আন্তর্জাতিক ক্যানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে সোনার পদকই পেয়েছেন তাই নয়, আমেরিকার ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির হবার্ড মেডেলটিও লাভ করেছেন তিনি। সারা পৃথিবীতে তাঁর ফিল্মের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে, পয়সা প্রচুর পেয়েছেন ফিল্ম থেকে।

'ওয়ার্ল্ড উইদাউট সান' ফিল্মখানি তুলতে গিয়ে কোস্তু যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, তা থেকেই তিনি বলেছেন, "সমুদ্রের নিচে মানুষ বসতি করে থাকতে যে পারে, তার সম্ভাবনা বেশ বোঝা গেছে"; তবে আরও অনেক গবেষণা, অনেক এক্‌সপেরিমেন্ট এখনো চালাতে হবে।"

ফিল্মটিতে দেখানো হয়েছে, জলের নিচে তারকার আকৃতির বসতি হয়েছে, সে বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হয় বিশেষ ধরনের মই বেয়ে। ভেতরে জল ঢোকে না, দিব্যি সবাই খায়দায়, ঘুমোয়, গান গায়, দাবা খেলে, সব কিছুই করে। জলের মধ্যে বেরিয়ে বেড়াতেও পারে জলরোধী পোশাক পরে।

ফিল্মটি যেন বাস্তব জীবনের নাটকীয় চিত্ররূপ। এর মধ্যে সত্যিকারের দুটি বিরাট বৈজ্ঞানিক গবেষণার কথা বলা হয়েছে। একটা গবেষণা হল, কিভাবে সমুদ্রচারীরা বেশ কিছুদিন জলের নিচে বেঁচে থাকতে পারে। দ্বিতীয় গবেষণাটি হল, সমুদ্রের নিচে বাস করার সময়ে মানুষ কতরকম কাজ করতে পারে, মাছ ধরা, ঢেউ বোঝা, মাছেদের ওপর রং-এর প্রভাব দেখা ইত্যাদি।

রঙিন বলে ফিল্মটি চমৎকার হয়েছে। সূর্যহীন অন্ধকার সমুদ্রের জগতে যে এত মন মাতানো রং-এর বাহার আছে তা ফিল্মটি না দেখলে বিশ্বাসই হবে না।

ছবিটি তুলতে যে কী দুঃসাহস আর মনোযোগ লেগেছে তার বুঝি হিসাব নেই। কী দারুণ বিপদ মাথায় নিয়ে ছবিওয়ালারা নেমেছিলেন এ কাজে, সফলও হয়েছেন,বাহবা পেয়েছেন, পাবেনই তো। মাটির বুকের মানুষের চোখে এমন দুর্লভ দৃশ্য নির্ভেজালভাবে তুলে ধরা তো মস্ত বড় কাজ। এ ছবি না দেখে কোনো মানুষ থাকতেই পারবে না। সাগরের অতলান্ত রহস্য নিয়ে কার না কৌতূহল?

এ তো কেবল একটা ফিল্ম নয়, যেন আধুনিক আবিষ্কার অভিযানের এক মহাকাব্য। কী মহৎ কল্পনা বৈচিত্র্য, কী আকুল-করা নিখুঁত রহস্য নিয়ে চিত্রায়ন! কোস্তু সমস্ত পৃথিবীকে ঋণী করে রেখেছেন তাঁর অপূর্ব বিজ্ঞান-কল্পনার এমন চিত্র বর্ণনা দিয়ে।

মহাকাশে ফ্লাইং সসারের মতো মহাসমুদ্রে ডাইভিং সসার নামিয়েছেন কোস্তু। দেখবার মতো বিচিত্র তার গড়ন, চমকপ্রদ তার গতিপ্রকৃতি। পাঁচ ফুট উঁচু, দু'ফুট সাত ইঞ্চি চওড়া। ক্যামেরা, ফ্লাশ, ওয়াটার-জেট সব কিছু ফিট করা আছে। দশটা 'চোখ' লাগানো আছে এর গায়ে,চারিদিকে কি ঘটছে সব দেখা যায়, বোঝা যায়। সসারের গায়ে লাগানো আছে চিমটের মতো কলের হাত, তা দিয়ে সমুদ্রবুক থেকে ইচ্ছামতো এটা সেটা তুলে নেওয়া যায়।

কলকাতায় কিছুদিন আগে ফিল্মটি এসেছিল। সায়ান্স-ফিকশ্যান সিনে ক্লাবের সদস্যদের জন্য এই বিশেষ প্রদর্শনীতে ছবিখানি আবার দেখানোর ব্যবস্থা হল। ■ পুনর্মুদ্রণ ২-১১-৬৯

ভয়ঙ্কর দিন

দেবকী বর্ধন

গত বছরের অর্থাৎ ২০০৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছে আকাশের দিকে এক মহাজাগতিক দৃশ্য। সন্ধ্যার একটু পরেই আকাশের উত্তর-পূর্ব দিকে থেকে এক বিশাল অত্যুজ্জ্বল আলোকপিণ্ড প্রচণ্ড বেগে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে চলে গেল। সংবাদপত্রে এবং টিভির খবরেও প্রকাশ একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড নাকি উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলের আকাশে দেখা গেছে। এটি পড়েছে ভুবনেশ্বরের কাছাকাছি গ্রামাঞ্চলে, ওজন প্রায় ৫৭০০ কিলোগ্রাম। শহরের বহু লোক জড় হয়ে এটি দেখতে এসেছিলেন।

উল্কাপিণ্ডটি ছিল ধূসর রঙের এবং এবড়ো-খেবড়ো দেখতে। বিভিন্ন রকমের খনিজ দ্রব্যে এই উল্কাপিণ্ডটি ভরপুর। এটিকে ট্রাকে তুলে এখন স্থানীয় জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়াতে রাখা হয়েছে। ওই একই দিনে ময়ূরভঞ্জ জেলার বিভিন্ন গ্রামে পড়া এই উল্কাপিণ্ডটির কিছু কিছু ভগ্নাংশ সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে। ভবিষ্যতে ল্যাবরেটরিতে গবেষণা করে এর থেকে মহাকাশের অনেক অজানা তথ্য উদঘাটন করা যাবে বলে প্রকাশ। এটি পড়ার ফলে অবশ্য ওই অঞ্চলের বিশেষ কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি।

কিন্তু এর চেয়েও আরও ভয়ঙ্কর একটা দিন এগিয়ে আসছে শীঘ্রই। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝের গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে একটি বিশাল উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসছে। আমেরিকার জ্যোতির্বিদগণ বলেছেন, এটি পৃথিবীকে ধাক্কা মারতে পারে আগামী ২০১৪ সাল নাগাদ। এটির নামকরণ করা হয়েছে "2014 47"। যদিও পৃথিবীর সঙ্গে এর সোজাসুজি সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রায় ৯০৯,০০০ ভাগের একভাগ মাত্র, তবুও হিসাব অনুযায়ী সংঘর্ষের সঠিক দিন হচ্ছে আগামী ২০১৪ সালের ২১শে মার্চ। জ্যোতির্বিদগণ আগামী ২ মাস ধরে এক নাগাড়ে এর ওপর নজর রেখে গবেষণা চালাবেন এবং আরও বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ হলে, বোধ করি সোজাসুজি সংঘর্ষের সম্ভাবনা কমতে পারে বলে আশা করা যায়।

এই প্রসঙ্গে এইচ. জি. ওয়েলসের স্টার নামক রচনাটির কথা মনে পড়ে। একটি বিশাল নক্ষত্রসম উল্কা পৃথিবীকে ধাক্কা না মেরে বেশ কয়েক হাজার মাইল দূর দিয়ে চলে যায়। যার ফলে সারা পৃথিবীতে ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক বিপর্যয়, যেমন ঝড়-জল, ভূমিকম্প, সমুদ্রে জলোচ্ছ্বাস ইত্যাদি ঘটেছিল। তবে হ্যাঁ, ২০১৪ সালে যদি এই উল্কাপিণ্ডটি পৃথিবীকে ধাক্কা মারে, তাহলে তার শক্তির পরিমাণ হবে জাপানে হিরোশিমায় ফেলা অ্যাটম বোমার মত শক্তিশালী ২ কোটি অ্যাটম বোমার সমান শক্তি। সুতরাং সেই দিনটি পৃথিবীর কাছে এক ভয়ঙ্কর দিন ছাড়া আর কি বলা যায়। ■

কী এই প্লুটো?

সুরজিৎ দে

কি বলা যায় প্লুটো গ্রহকে? অতি নগণ্য, না, অতিকায় গ্রহ? কোনওটাই নয়? স্রেফ ভুতুড়ে? পুঁচকে আর প্রহেলিকাবৎ প্লুটো সম্বন্ধে একটা ব্যাপার কিন্তু নিশ্চিত। ১৯৩০ সালে এই গ্রহ আবিষ্কৃত হওয়া ইস্তক ধোঁকা জাগিয়ে এসেছে বৈজ্ঞানিক আর সাধারণ মানুষের মনে। মরীচিকায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকার মতো একটা বুঝে-না-ওঠা ব্যাপার। সৌরজগতের অজানা মাটির সর্বশেষ পিণ্ড---ইউরেনাস, নেপচুন-এর আওতার বাইরে বরফ প্রতিম খুদে গ্রহদের অন্যতম---গত ১৩ বছর ধরে ইউরেনাস, নেপচুন গ্রহে 'ভয়েজার' মহাকাশযান অভিযান চালানোর পরেও আজও অনাবিষ্কৃত যে গ্রহ—প্লুটো।

প্লুটো অভিযান কিন্তু সময় নিচ্ছে অনেক প্রায় ৩০ বছর ৪.৮ বিলিয়ন কিলোমিটার পেরিয়ে যেতে।

বিলিয়ন একটা অঙ্ক যার দু'রকম মানে দাঁড় করিয়েছে ইউরোপ। ইংল্যান্ড আর জার্মানিতে এক বিলিয়ন মানে এক মহাপদ্ম, অর্থাৎ ১,০০০,০০০,০০০,০০০ ; ফ্রান্স আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক বিলিয়ন মানে শতকোটি, অর্থাৎ ১,০০০,০০০,০০০। মানব দেহের কোষ সংখ্যা মাত্র ষাট মহাপদ্ম।

বিস্তর সময় নিলেও প্লুটো আর অজানা গ্রহ থাকবে না বেশিদিন। সৌরজগৎ অভিযাত্রীরা এখন বিশ্বাস করেন, প্লুটো রহস্যের ঢাকনি উন্মোচিত হয়ে যাবে তাঁদের জীবদ্দশাতেই।

ভুতুড়ে জগৎ

রহস্য। রহস্য। রহস্য। বৈজ্ঞানিকদের এখনকার ধারণা প্লুটো হয়তো গ্রহই নয়—আসলে একটা ধূমকেতু ... নিছক ধূমকেতু নয় ... ধূমকেতু সম্রাট। সম্প্রতি যে কুইপার বলয় (Kuiper Belt) আবিষ্কৃত হয়েছে—তাদের মধ্যে বৃহত্তম। যে বলয়ের মধ্যে রয়েছে লক্ষ লক্ষ বরফ পাথর আর জমাট গ্যাসের টুকরো— ৪ বিলিয়ন আগে সৌরজগৎ সৃষ্টি হওয়ার সময় থেকে যাদের মধ্যে কার্যত কোনও পরিবর্তন আসেনি।

প্রথমে ভাবা হয়েছিল প্লুটো একটা পুঁচকে আর পাগলা গ্রহ, এখন ভাবা হচ্ছে মোটেই তা নয়— প্লুটো কুইপার বলয় বস্তুদের মধ্যে বৃহত্তম।

বিজ্ঞানীরা রকেট ছুঁড়ে প্লুটো-য় নামাতে চান। ২০০৬ সালে। প্লুটোয় পৌঁছতে সময় লাগবে ন'বছর। প্লুটোর কাছাকাছি হওয়ার সময় পাঁচ মাস। এই পাঁচ মাসেই প্লুটো পর্যবেক্ষণের সমস্ত খবর চলে আসবে পৃথিবীতে। জানা যাবে, ৭২ বছর আগে 'আরিজানা'র জ্যোতির্বিজ্ঞানী ক্লাইভ টমবাও যা বলেছিলেন, সেইটাই সত্যি কিনা।

৭২ বছর আগে নেপচুন গ্রহের গা ঘেঁষে থাকা পুঁচকে একটা বিন্দু দেখে উনিই বলেছিলেন—দেখলাম একটা নতুন গ্রহ!

যে যাই বলুক, প্লুটো বাস্তবিকই কিম্ভূত গোলক, ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের এক-পঞ্চমাংশেরও কম। লাগোয়া একটা চাঁদও আছে— তার নাম চ্যারন। সাইজে প্লুটোর অর্ধেক—তুলনামূলকভাবে সৌরজগতে বৃহত্তম। সেখানকার বাতাস বড় বিচিত্র। সূর্যের কাছাকাছি এলে আবহমণ্ডল খুব পাতলা—মূলত নাইট্রোজেন গ্যাস; সূর্যালোক প্রাপ্তি অতীব কম—পৃথিবী যা পায়, তার শতকরা এক ভাগের দশভাগের একভাগ। বিশ বছর পরে প্লুটো ঠিকরে যাবে আরও বাইরে—তখন বোধহয় বাতাস জমে থাকতে দুশো বছর।

হেলে দুলে যাচ্ছে অদ্ভুত জগৎ

রকেট উড়ে যাবে প্লুটো-র কাছাকাছি—৯,৬৫০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত—তার বেশি কাছে যেতে পারবে না। অনেক খুঁটিনাটির ছবি তুলে নেবে—পেল্লায় সাইজের বাড়ির মতো বড় যা—সেই পর্যন্ত—তার চাইতে ছোট বস্তুর ছবি উঠবে না। প্লুটো পৃষ্ঠে খনিজ বস্তুর মানচিত্র রচনাও হয়ে যাবে যান্ত্রিক রাসায়নিক বিশ্লেষণে। কাছাকাছি যাওয়ার পরেই তো জানা যাবে, প্লুটো পৃষ্ঠে আদৌ ধুলো-ঝড় নৃত্য করে বেড়ায় কিনা, চ্যারন-চাঁদের বুকে আগ্নেয় পর্বতরা তরল জল আর অ্যামোনিয়া বমি করে কিনা।

অভিযাত্রী রকেট উড়ে যাবে প্লুটো মহাপ্রভুর পাশ দিয়ে—খুঁজে নেবে নতুন নতুন মিনি-জগৎ—কুইপার বলয়ের মধ্যে যাদের অধিষ্ঠান। ফলে, জানা যাবে প্লুটো আর এই সব অতি খুদে বরফ-জগৎদের মধ্যে তফাৎটা কোথায়—প্লুটো একটা গ্রহ—এহেন ধারণা যাঁদের মাথায় গেঁথে আছে—তাঁরা পাবেন উৎসাহ।

এই যে অতি খুদে অজস্র বরফ-জগৎ, এদের প্রত্যেকেই কিন্তু এক-একটা প্রহেলিকা। টেলিস্কোপে আজ পর্যন্ত দেখা গেছে, সংখ্যায় এরা ৬০০-রও বেশি—হিসেব করে মনে হচ্ছে, মোট সংখ্যা লাখ দশেক হলেও হতে পারে। সত্তর হাজারের ব্যাস প্রায় ৯৬ কিলোমিটার। কয়েক সপ্তাহ আগে ক্যালটেক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কুইপার বলয়ের মধ্যে ১২৯০ কিলোমিটার মাপের একটা বস্তু পেয়েছেন—১৯৩০ সালে প্লুটো আবিষ্কারের পর সৌরজগতে এত বড় বস্তু আর মেলেনি।

২০১১ সাল থেকে খুঁটিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ—উজ্জ্বল যারা, দেখা হবে শুধু তাদেরকেই—এরাই তো সেই সব গ্রহাণু যারা পৃথিবীর বুকে প্রলয় জাগাতে পারে, পৃথিবীকে নিশ্চিহ্নও করে দিতে পারে।

খান কয়েক খুদে গ্রহের কক্ষপথ প্লুটোর কক্ষপথের সঙ্গে পাল্লা দেয়। তাল রেখে চলে দানব নেপচুনের সঙ্গে। অন্যান্যরা যেন একেবারেই বন্য—সূর্যকে ছাড়িয়ে ১৬ বিলিয়ন কিলোমিটারব্যাপী পাগলাটে কক্ষপথে বিচরণ করে যাচ্ছে ক্ষিপ্তের মতো। তৃতীয় দলে যারা আছে, তাদের প্রায় গোলাকার কক্ষপথ রয়েছে সূর্য থেকে সাড়ে ছয় বিলিয়ন কিলোমিটার দূরে—নেপচুনের থেকেও দূরে। তাইতেই তো ধোঁকা লাগছে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের। এতদিন ধরে ভঙ্গুর এই কক্ষপথগুলো টিকে আছে কি করে।

সূর্যের গা ঘেঁষে প্রায়ই বেরিয়ে যায় যে সব পুচ্ছধারী ধূমকেতু—অথবা, ধূম্রপ্রলয়—গ্যাস আর ধুলোর সমারোহ দেখিয়ে—তাদের অধিষ্ঠান ছিল নাকি এই কুইপার বলয়ে—কোনও এক সময়ে। আর এক পুচ্ছধারীর গুঁতো খেয়ে ঠিকরে এসেছে ঠুনকো কক্ষপথ থেকে?

নিঃসীম শৈত্য

কুইপার বেল্ট (বলয়) যেখানে, সেখানেই হয়তো পাওয়া যাবে নিদারুণ ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া বস্তুসমূহ—প্রাথমিক পর্যায়ের গ্যাস আর ধুলো—যারা জমে গিয়ে জড়ো হয়ে বানিয়েছে সূর্য আর তার পরিবারকে। খুঁজে পাওয়া যাবে আদিম সেই মেঘপুঞ্জ—জানা যাবে তার চেহারা,কি-কি ছিল তার মধ্যে। সৌরজগতের কিনারা বিচার করেও মিলবে তার আদি বাড়ির হদিশ, সূত্র। জানা যাবে, কি ধরনের রাসায়নিক ঝোল পেকে গড়ে উঠেছে আদিম পৃথিবী। কুইপার বলয়ের বেশিরভাগই নিশ্চয় জল আর কার্বন-ডাই-অকসাইড বরফ। কিন্তু হয়তো কল্পনাতীতকাল ধরে বিকিরণ আঘাত হেনে হেনে খোসা-র ওপরকার কয়েক মিটারে এনেছিল রাসায়নিক পরিবর্তন। ('টোস্ট' সেঁকার মতো)—যেখানে রয়েছে বিস্তর কার্বন আর হাইড্রোকারবন। সৌরজগৎ সৃষ্টির প্রথম প্রলয়ঙ্কর পর্যায়ে হয়তো এই কুইপার বেল্ট-এর বড়সড় বস্তুগুলোই পৃথিবীকে চাবকে চাবকে শুধু জল সৃষ্টি করেনি—প্রাণের মূল জৈব পদার্থও বানিয়ে দিয়ে গেছে। প্রাণরহস্য তাহলে বেশি দূরে নেই? ■

কুইজ

ইনি কে?

জয়

১. ঠিক যে সময়ে শেকসপিয়র ডেনমার্কের এক বিষণ্ণ যুবরাজকে নিয়ে লেখা তাঁর নাটক মঞ্চস্থ করতে যাচ্ছিলেন, ঠিক তখনই মারা যাচ্ছিলেন ডেনমার্কেরই সত্যিকারের সম্ভ্রান্ত এই মানুষটি।

২. ইনি মারা যাচ্ছিলেন স্রেফ বদ হজমে।

৩. মরতে মরতে মেধাবী সহকারীকে ডেকে তাঁর অসমাপ্ত কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন।

৪. সহকারী কথা দিতেই মৃত্যু-যন্ত্রণা ভুলে গেছিলেন।

৫. ঘণ্টা কয়েক পরেই মারা গেছিলেন সেই সময়ের সবচেয়ে বড় এই জ্যোতির্বিজ্ঞানী।

৬. মৃত্যুকালেও তাঁর দেখবার মতো বিশাল শরীরের ভারে খটমট করে উঠেছিল খাট।

৭. মৃত্যু যখন উপস্থিত, তখনও তাঁর তীক্ষ্ণ চোখের জ্যোতি একটুও কমেনি—যে চোখ দিয়ে তিনি চল্লিশ বছর ধরে আকাশ পর্যবেক্ষণ করেছেন—টেলিস্কোপ ছাড়া।

৮. মোমবাতির আলো ঠিকরে গেছিল মানুষটার রুপো আর সোনা দিয়ে বাঁধানো নাকের ডগা থেকে। যৌবনে এঁর নাক কাটা গেছিল তরবারি যুদ্ধে।

৯. জন্ম থেকে মরণকাল পর্যন্ত দুর্ধর্ষ ছিলেন। খানদানি জীবনযাপন করেছেন বনেদি চালে। কৃষ্টি, সংস্কৃতি, নিষ্ঠুরতা আর গরিবকে-গরিব-রেখে একাই-সুখে-থাকবো মনোবৃত্তি ছিল তাঁর রক্তে—আমরণ।

১০. ষোড়শ শতকের ইউরোপের বিলাসিতায় ইনি ডুবে ছিলেন।

১১. অথচ, পার্থিব সুখে মগ্ন থেকেও, পৃথিবীর বাইরের জগৎ নিয়ে ভেবে গেছেন—সারাজীবন। বৈপরীত্য ছিল তাঁর চরিত্রের কাঠামো।

১২. ছোটবেলায় এঁকে এঁর নিঃসন্তান কাকা কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়ে মানুষ করেছিলেন।

১৩. সাত বছর বয়েসে অনর্গল ল্যাটিন বলে যেতেন, চমৎকার কবিতা লিখতেন, তরবারি যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন, সঙ্গীতের স্বরলিপি লিখে ফেলতেন, তর্কযুদ্ধে চৌকস কাকা-কে হারিয়ে দিতেন।

১৪. বারো বছর বয়েসে কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ে গেছিলেন বাগ্মিতা আর দর্শন অধ্যয়ন করতে।

১৫. সেই সময়ের রেওয়াজ অনুসারে ইনি জ্যোতিষবিদ্যা অর্জনে বেশি মন দিয়েছিলেন।

১৬. ভবিষ্যৎ কথন অনুযায়ী ১৫৬০ সালের আগস্ট মাসের সূর্যগ্রহণ দেখে জ্যোতিষশাস্ত্র আর জ্যোতির্বিজ্ঞানকে আঁকড়ে ধরেছিলেন—জীবনব্যাপী গবেষণায় পরিণত করেছিলেন এবং জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন।

১৭. কাকাকে ধরে চলে গেছিলেন লাইপৎজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে—শীর্ষস্থানীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের কাছে থেকে জ্ঞান সঞ্চয় করতে।

১৮. দ্রুত সব শিখে নিয়ে স্ব-অধ্যয়নে মন দিয়েছিলেন। ১৭ বছর বয়েসে গগন-জ্যোতিষ্কদের পদ্ধতিমাফিক ছকে আনলেন। সেই সময়ে গগন পর্যবেক্ষণ ছিল এলোমেলো রকমের। ম্যাজিক, কুসংস্কার আর পুরাণ নির্ভর।

১৯. পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে, কোপারনিকাসের এই তত্ত্বকে ইনি মেনে নিতে পারেননি খাঁটি খ্রিস্টান ছিলেন বলে, পৃথিবীকে হেয় করা হয় বলে। তাই রচনা করেছিলেন নিজস্ব তত্ত্ব—ব্রহ্মাণ্ড পরিকল্পনা—সমস্ত জ্যোতিষ্ক পৃথিবীকে দিনে রাতে একবার প্রদক্ষিণ করে; এই সঙ্গে, সমস্ত গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে; এবং সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। এক কথায়, পৃথিবী রয়েছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে। অস্বীকার করেন পৃথিবীর গতি। অর্থাৎ, পৃথিবী নিশ্চল। মহাপ্রভু।

২০. ১৫৭২ সালে মধ্য-আকাশে বোমার মতো বিস্ফোরিত এক নক্ষত্রকে দেখে তার নাম দেন 'নোভা'। পুরনো অ্যারিসটটল-তত্ত্ব বাতিল করে দেন এই বিষয়ে একটা বই লিখে।

২১. ডেনমার্কের রাজা তাঁকে একটা দ্বীপ উপহার দেন মানমন্দির করার জন্যে। সেই সঙ্গে বিশ হাজার পাউণ্ড—দ্বীপ সাজানোর জন্যে—তখনকার দিনে অনেক টাকা। সেই সঙ্গে মাসে মাসে টাকা।

২২. নিজের পকেট থেকে আরও বিশ হাজার পাউণ্ড ঢেলে বাগান সমেত চোখ ধাঁধানো পেল্লায় প্রাসাদ বানিয়েছিলেন সেই দ্বীপ। প্রথম মানমন্দির ছিল একটা পাহাড়ের ওপর—যার নাম 'স্বর্গের মন্দির'। দ্বিতীয়টা বানিয়েছিলেন মাটির তলায়—শুধু বেরিয়েছিল ছাদ।

২৩. মাথা খাটিয়ে একটা বিশাল কোয়াড্রান্ট (উচ্চতামাপক বৃত্তপাদ যন্ত্র) বানিয়েছিলেন—যাকে তুলতে গেলে লাগতো বিশজন জোয়ান।

২৪. প্রাগ-য়ের সম্রাটের কাছে চাকরির দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন ছাপিয়ে আর বাঁধিয়ে।

২৫. মঙ্গলগ্রহকে চার বছর ধরে পর্যবেক্ষণ করে অত্যাশ্চর্য সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন।

২৬. কাজের চাপ সামলাতে সহকারী নিয়েছিলেন যাঁকে, বিরুদ্ধমতবাদী সেই কেপলার জগদ্বিখ্যাত হয়েছিলেন পরে—স্বমহিমায়।

২৭. শুধু চোখে আকাশ পর্যবেক্ষণে সবচেয়ে বড় জ্যোতির্বিজ্ঞানী ইনি।
ইনিই ভুবনপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক টাইকো ব্রাহে। ■

ভিন্ন ধর্ম বিশ্বাস নিয়েও আমরা থাকতে পারি বন্ধুর মত শান্তিতে, সম্প্রীতিতে

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষায় আমরা বদ্ধপরিকর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৫৩১৫/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

আপেক্ষিক তত্ত্ব ও খুন

সুব্রত চক্রবর্তী

সংবাদপত্রে প্রকাশিত এক বিস্ময়কর হত্যাকাণ্ডের খবর কলকাতার অনেকেরই নজর হয়ত এড়িয়ে গেছে। কেন না, আফশোষের কথা, এদেশের সংবাদ ব্যবসায়ীরা ঘটনার চমৎকারিত্ব বা গুরুত্ব—কোনওটাই বুঝে উঠতে পারেননি এ যাবৎ। আর তাছাড়া দেশে তখন ভয়ঙ্কর খাদ্য সঙ্কট, সীমান্তে পীতভীতি, শিক্ষা ব্যবস্থায় অচলায়তনের বিপজ্জনক সম্ভাবনা আর সর্বোপরি ভাষা প্রশ্নে তামিলনাদের উত্তাপ ক্রমশ সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ছে। বাজেট অধিবেশনের পরের দিন সংবাদপত্রে বড়ই স্থানাভাব এবং সংবাদ পাঠকের অধিকাংশের স্বার্থই যেহেতু বাজেটের উপর নির্ভরশীল, পাঁচ-দশ টাকার আয় বৃদ্ধির আনন্দ বা হতাশা অতিক্রম করে অপ্রয়োজনীয় সপ্তম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমের সাত লাইনের খবরে তাদের দৃষ্টি না পড়াই স্বাভাবিক। খবরটির শিরোনামায় লেখা 'মেকসিকোর সমুদ্র উপকূলে বিচিত্র মৃতদেহ' এবং নিচে মুদ্রিত ছিল

এক বিদেশী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান মারফৎ প্রেরিত সংবাদে জানা গিয়েছে যে মেকসিকোর সমুদ্র উপকূলে এক বিচিত্র মৃতদেহ বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে। উপকূলবর্তী ধীবরেরা সমুদ্রতীরে কূপের মতন এক গভীর গর্তে যারপরনাই বিস্মিত হয় এবং পরে সেই কূপের নিয়ে এক অজ্ঞানামা নারীর দুমড়ে যাওয়া মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। বেলাতটে এই প্রকার কূপ খনন অস্বাভাবিক বলিয়া ঘটনাটি সংশ্লিষ্ট মহলে বিশেষ কৌতূহল ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

বাস্তবিকপক্ষে খবরটির উপর আমারও প্রথম নজর পড়েনি। কেন না, সকালের ট্রেনেই আমার রাণাঘাট যাওয়ার তাড়া ছিল, সকালবেলা ঘুম ভাঙতেও দেরী হল খুব, সংবাদপত্রের পাতা ক'টি দ্রুত উল্টিয়ে বাথরুমে গেলাম। শাওয়ারটা খুলতেই ফোনের বাজনা শোনা গেল এবং তারপরেই 'বাবা তোমার ফোন' ...'সুতরাং বিরক্তি, ক্রোধ এবং ফোনটাকে বিদায় করতে হবে' তাই ভাবলাম।

"হ্যালো, মহলানবীশ স্পিকিং—"

"মহলানবীশ, আমি বান্ধবলীন্দ্র কথা বলছি। আজকের খবরের কাগজটা দেখেছেন!"

"কই আর দেখলাম সকাল থেকেই যা তাড়া। কিন্তু কি ব্যাপার—বাজেট মনঃপুত হয়নি!"

"হ্যাং ইয়োর বাজেট। আমি মেকসিকোর খবরটার কথা বলছি।"

"মেকসিকো? সেখানে আবার কি হল! কই, সেরকম কোনও খবর তো নজরে পড়ল না।"

"পড়বে কি করে। ইডিয়ট এডিটাররা খবরের ইম্পর্ট্যান্স বোঝে? হাতের কাছে কাগজ আছে? একবার সপ্তম পৃষ্ঠায় ষষ্ঠ কলমটা দেখুন।"

দেখলাম, এবং!

"কোনো খবরটার কথা বলছেন? অস্ট্রিয়ান সরকার বিনা শর্তে দেড় লক্ষ টন গম দেবেন—এটা কি?"

"না, না। আরো নিচে। 'মেকসিকোর সমুদ্র উপকূলে বিচিত্র মৃতদেহ'—পেয়েছেন?"

পেলাম এবং এই প্রথম খবরটা পড়লাম। পড়েও কিন্তু বান্ধবলীন্দ্রর উত্তেজনার কোনো কারণ বুঝতে পারিনি। সে কথা বলায়, বললেন যে, ফোনে নাকি সব কথা বিস্তৃতভাবে বলা সম্ভব নয়, তিনি কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার এখানে আসছেন এবং সনির্বন্ধ অনুরোধে জানালেন আজ যেন আমি কিছুতেই রাণাঘাট না যাই।

কিন্তু তাঁর প্রস্তাবে রাজি হওয়া আমার পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হল না। পরদিন সকালে তাঁর সঙ্গে দেখা করব জানিয়ে আমি রাণাঘাট চলে গেলাম।

ফিরতে রাত হল খুব, সারাদিনের পরিশ্রমে ক্লান্তিও আপাদ-মস্তকে। বেশ বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েছিলাম তাই, ভাঙলো বান্ধবলীন্দ্রর হাঁকডাকে, "কি মশাই, এখনো ঘুমোচ্ছেন, এদিকে যে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গেছে"—বলে তিনি সেদিনের কাগজটা এগিয়ে ধরলেন।

প্রথম পৃষ্ঠার নিচের দিকে খবরটা ছিল। শিরোনামা : 'দীঘার সমুদ্র উপকূলে বিচিত্র মৃতদেহ''। আর নিচের সংবাদের শেষাংশ, গতকাল সন্ধ্যায় দীঘায় সমুদ্র উপকূলে স্থানীয় ধীবরেরা এক বিচিত্র মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে। কূপের মতন গভীর এক গহ্বরে বালির প্রায় ত্রিশ ফুট নিচে মেকসিকোর সমুদ্র উপকূলের অনুরূপ, এক্ষেত্রে পুরুষ, মৃতদেহটি সংশ্লিষ্ট মহলে বিশেষ বিস্ময় ও কৌতূহলের সৃষ্টি করেছে।

আমি এই প্রথম সঠিক অর্থে কৌতূহলী হলাম। "বলি, কি ব্যাপার বলুন তো?"

"আরে মশাই,কি ব্যাপার জানলে তো হয়েই গেছলো। চলুন, একবার দীঘায় যাওয়া যাক। মৃতদেহটা একবার দেখা দরকার।"

হেসে বলি, "কিন্তু সেকি আর এখনো সেখানে আছে। হয়তো পোস্টমর্টেমের জন্য মেদিনীপুরে নিয়ে গেছে। খোঁজ নিন।"

বাহুবলীন্দ্র খোঁজ নিল। আমার অনুমানই ঠিক। তবে, মেদিনীপুরে নয়, বদলে কলকাতায়।

পুলিশ ইন্সপেকটর ভাস্কর পত্রনবীশ আমাদের বিশেষ বন্ধু। শুনেটুনে বললেন, "না, মৃত্যুর কারণ এখনো অজ্ঞাত। আর সমুদ্রতীরে এত গভীর কূপের আবির্ভাবও রীতিমতো বিস্ময়কর। মেকসিকোতে এজাতীয় মৃতদেহ পাওয়া গেছে। দেখি, সে দেশের সাথে যোগাযোগ করে রহস্যের কোন সুরাহা করা যায় নাকি।"

বাহুবলীন্দ্র শুধায়, "আপনারা কি কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না?"

ভাস্কর বললে, "কি আর বুঝবো মশাই। সমস্ত ব্যাপারটাই পুরোপুরি ফ্যানটাসটিক। মৃতদেহে অসংখ্য ফ্র্যাকচার আর তাছাড়া, এত সরু কূপে কি করে যে সেটা ঢুকলো তাও তো মশাই বুঝতে পারছি না। আপাতদৃষ্টিতে অসম্ভব। দেখা যাক, কি হয়।"

কিন্তু পরের দিনই যেকাণ্ডটা ঘটলো, তার ফলে আমরা সকলে বিমূঢ় হয়ে গেলাম। এবার আর মেকসিকোর সুদূরে নয়, দীঘার অনতিদূরেও না, খাস কলকাতায় প্রকাশ্য দিবালোকে ভ্রমণশীল নগরবাসীর চোখের সামনে বিস্ময়টি অনুষ্ঠিত হল—আউটরাম ঘাটের কাছাকাছি গঙ্গার তীরে কতিপয় প্রেমিক যুগল, ছাতুভোজন-মগ্ন বিহারী মানুষ ও অম্লরোগী ভ্রমণশীল পঁচিশ-ত্রিশ জন নগরবাসীর চোখের সামনে। বিকেল তখন গাঢ় হয়ে এসেছে, গড়ের মাঠের উপর দিয়ে একঝাঁক পাখি-পাখালি বাড়ি ফিরল, এক বিদেশী জাহাজ বাঁশীর গম্ভীর আওয়াজে ঘোষণা করল, বন্দরের কাল হল শেষ। "যাও ভারী অসভ্য হয়েছো"—এ জাতীয় তিরস্কারে প্রেমিকরা মুখর হয়ে আছে তখন, দুইজন বিদেশী নাবিক ফিটফাট হেঁটে চলে গেল চৌরঙ্গীর দিকে—সুতীব্র এক সিটিতে চমকে উঠল সকলে—আর হঠাৎ এক কূপের সৃষ্টি হল সকলের চোখের সামনে।

ঘটনাটির আকস্মিকতায় দর্শকজন কিছুক্ষণ কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি। বেশ খানিকক্ষণ পরে, একজন প্রেমিক, 'দেখে আসি, ব্যাপারটা' তার প্রেমিকাকে এই কথা কটি বলে বীরত্বব্যঞ্জক হাসলো। ক্রমে অনেকে ভিড় করল কূপের কাছাকাছি, এল পুলিশের লোকেরা, কে তাদের খবর দিয়েছে যেন, কূপের গভীরে কিছুই নজরে আসে না—দমকলকর্মীরা অবশেষে তুলে নিয়ে এল বেঁকে দুমড়ে যাওয়া একটি মৃতদেহ।

বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে এবারে আর সন্দেহের কোন অবকাশ রইল না। বাহুবলীন্দ্র, প্রথমেই বলেছিলাম, তখন তো আপনি উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, বলে বিজ্ঞজনোচিত হাসলো। পত্রনবীশ বলল যে, সমস্ত ব্যাপারটাই এখন স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন ব্রাঞ্চের হাতে, পুলিশের কিছুই করার নেই আর, তবে শোনা গেছে, একটা আন্তর্জাতিক জাঁদরেল তদন্ত কমিশন তৈরি হয়েছে। চীনকে বাদ দিয়ে পৃথিবীর বিখ্যাত কয়েকজন বৈজ্ঞানিকও সেই কমিশনে আছে—দেখা যাক রহস্যের কোন সুরাহা হয় কি না।

বেশ কিছুদিন কেটে গেল অতঃপর। এ জাতীয় ঘটনার পুনরাবৃত্তিও ঘটেনি কোথাও। কমিশনও তাদের কার্যকলাপ বিষয়ে নীরব একেবারে। পত্রনবীশকে শুধোতে, সে বললে, সিক্রেট। বাহুবলীন্দ্রর সাথে অনেকদিন দেখা হয় না। শোনা গেল সে নাকি সস্ত্রীক ভাইজাগ গেছে, সেখানের সমুদ্রতীরে সে জাতীয় এক ঘটনার পুনরাবৃত্তির আশা সে মনে মনে পোষণ করে, তার নিন্দুকেরা একথা বলে থাকেন। বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর কলেজ খুলছে, আমিও তিন সিফটে পড়িয়ে অন্য বিষয়ে চিন্তা করার অবকাশ পাই না বিশেষ।

সেদিনের কাগজটা আর পড়া হয়নি, ট্রামে এক যাত্রীর হাতে দেখেছিলাম প্রথম পৃষ্ঠার শিরোনামায় লেখা, "চীনা বৈজ্ঞানিকের চাঞ্চল্যকর সাফল্য'—সহযাত্রীদের মুখে এলোমেলোভাবে কিছু কথা ও মন্তব্য শুনেও কিছু বুঝে উঠতে পারিনি—তিন সিফটে অধ্যাপনা করে বাড়ী ফিরতে রাত হল খুব। শরীর ক্লান্ত ছিল, ছোট মেয়েটার ডিফথেরিয়া, মন ভাল ছিল না তাই। অল্প কিছু খেয়ে শুয়ে পড়লাম, হঠাৎ ঘুম চলে গেল। কিছুক্ষণ ছটফট করে আলো জ্বাললাম, দুটো সিগারেট খেলাম পর পর, অন্য মনস্কভাবে টেনে নিলাম সেদিনের কাগজখানা, পড়লাম—

চীনা বৈজ্ঞানিকের চাঞ্চল্যকর সাফল্য

আলোকের গতির সমতুল গতিসম্পন্ন যান আবিষ্কার ইত্যাদি। এবং সর্বশেষে লেখা, মেকসিকো, দীঘা ও কলকাতায় ইতিপূর্বে যে তিনটি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহাদের সাথে এই আবিষ্কারের কোন যোগসূত্র আছে কি না বৈজ্ঞানিকগণ সেই কথা গভীরভাবে চিন্তা করিতেছেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে ওই ঘটনাগুলি কেবলমাত্র হত্যাকাণ্ড নয়—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা।

আমি ইতিহাস পড়িয়ে থাকি, হত্যাকাণ্ডের সাথে এই আবিষ্কারের কোন সম্পর্কের সুদূর সম্ভাবনাও আমি চিন্তা করতে পারিনি।

বাহুবলীন্দ্র এল পরের দিন খুব সকালে। রবিবার, মর্নিং সিফটের কোন তাড়া ছিল না, ছোট মেয়েটার অসুখের জন্য দুশ্চিন্তা ছিলই, তবু বাহুবলীন্দ্রর উপস্থিতি ভালই লাগলো। সে পদার্থ বিজ্ঞানের তুখোড় এম এসসি।

বললে, আমারও মনে এই কথা ছিল।

আমি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বললাম, 'কেমনে বেটা পেরেছে সেটা জানতে'। কিন্তু কি ব্যাপার।

'চৈনিক আবিষ্কারের কথা পড়েছেন? নাকি সময় করে উঠতে পারেননি এখনো।'

বলি, 'পড়েছি তো,কিন্তু—'

বিরক্তিকরভাবে হাসলো বাহুবলীন্দ্র, "কিছু বুঝতে পারছেন না, অর্থাৎ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে এই আবিষ্কারের কি এমন সম্পর্ক থাকতে পারে, তাই না"। সম্মতিসূচক হাসল।

বাহুবলীন্দ্র বিজ্ঞের মতো বললে, "আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিয়োরীর কথা শুনেছেন কিংবা লোরেনৎস ফিটজেরালড কনট্রাকশন?"

'প্রথমটার কথা কানে এসেছে আপনাদের কল্যাণে' আমি বলি, 'কিন্তু দ্বিতীয়টা তো খটোমটো লাগছে।'

বাহুবলীন্দ্র বললো, 'মোটা বাংলায়, বস্তুর আকার ও ভর গতির উপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ গতির সাথে ওই দুটোর পরিবর্তন হয়।'

অসহায়ভাবে বলি, 'কিন্তু—'

বাহুবলীন্দ্র একটা সিগারেট ধরিয়ে হঠাৎ যেন অন্য মনস্ক হয়ে গেল। কয়েক সেকেণ্ড কথাই বললো না কোন। আয়েস করে ধোঁয়াটোয়া ছেড়ে বললো, 'ব্যাপার কি জানেন, দুটো ইকুয়েশন সূত্র আছে যার সাহায্যে খুব সহজেই এটার ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু আপনি তো অংকে একেবারে ক অক্ষর গোমাংস। ওই ইকুয়েশন থেকে খুব সহজেই প্রমাণ করা যায় গতির সাথে সাথে আকার হ্রাস পায় ও ভরের বৃদ্ধি ঘটে।'

আমি বলি, 'লিখুনই না, দেখি কিছু বুঝতে পারি নাকি!'

বাহুবলীন্দ্র বিরিঞ্চিবাবার মতো হাসলো। বললো, 'অনর্থক। আচ্ছা, এক কাজ করি, ইকুয়েশন দুটো একটু সহজভাবে লেখার চেষ্টা করি, দেখুন, কিছু বুঝতে পারেন কি না।'

একটা কাগজ টেনে খসখসকরে কি যেন লিখলো সে। 'দেখুন।'

কিছুই না বুঝে বাহুবলীন্দ্রর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলাম। বললে, "কোন কিছুকে যদি প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন করে ছেড়ে দেওয়া হয় তার ওজন যাবে সাংঘাতিক বেড়ে, কিন্তু আকার হয়ে যাবে অসম্ভব ছোট।"

ইকুয়েশন দুটোর দিকে নজর দিয়ে এবার যেন সত্যিই কিছু বুঝতে পারলাম।

"ওজন যদি খুব বাড়ে এবং গতি যদি সাংঘাতিক হয়, তবে মাটির ত্রিশ ফুট নিচে চলে যাওয়া অসম্ভব নয় কিছু এবং আকার যদি খুব ছোট হয় তবে ওইটুকু গর্ত দিয়ে গলে যাওয়াও সম্ভব। পরে যখন গতিহীন হয়ে পড়ে, পূর্বাকৃতি ফিরে পেতে চায়। আর তখনি যায় বেঁকে।"

জলের মতন বুঝিয়ে দিল বাহুবলীন্দ্র। সিগারেট ধরিয়ে বললে, "কিন্তু আমি ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি না, ওই দুটোর মধ্যে সুদূরতমও কোনও যোগ সূত্র থাকা সম্ভব। এবং চুপি চুপি বলি, আমার যুক্তির মধ্যেও এক বিরাট ফ্যালাসি আছে।"

বলেই বাহুবলীন্দ্র হঠাৎ চলে গেল। ■ পুনর্মুদ্রণ আশ্চর্য! ডিসেম্বর ১৯৬৫

বিচিত্র খবর

সত্য বলতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কোন মনীষীরা?

জিয়ার্দানো ব্রুনো, সক্রেটিস।

●

সংলাপের মাধ্যমে সত্য লিখে বিপদে পড়েছিলেন কে?

গ্যালিলি গ্যালিলিও। কঠোর জেরায় হার্নিয়া হয়ে গেছিল, পরে কোর্টে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—যা বলেছি, সব ভুল বলেছি। অন্তরীণ থাকা অবস্থায় অন্ধ হয়ে মারা গেছিলেন।

●

নয়া নাক তৈরি প্রথম কোথায় হয়েছিল?

ভারতবর্ষে। এখন যার নাম রিনোপ্লাস্টি বা নবনাসিকা প্রস্তুতবিদ্যা। মনু-সংহিতায় ব্যভিচারের শাস্তিস্বরূপ অপরাধীর নাক-কান কাটবার নির্দেশ ছিল। এই কারণেই নয়া নাক তৈরি শুরু হয় সুশ্রুতের পরামর্শে গাছের পাতাকে প্রথমে কাটা নাকের সমান করে কেটে সেই পাতার মাপে গাল থেকে কিছুটা চামড়া যা টিশু কেটে ফেলতে হবে। সেই টিশু কাটা নাকের ওপর সযত্নে বসিয়ে সেলাই করলেই তা আস্তে আস্তে দেহের সঙ্গে জুড়ে যাবে। এইভাবে গাল থেকে মাংস কেটে নিয়ে কাটা কানের জায়গায় নতুন কান তৈরি হত। রিনোপ্লাস্টি ভারতবর্ষ থেকে ধীরে ধীরে অন্যান্য দেশে প্রবর্তিত হয়।

●

চৈনিক চিকিৎসার দার্শনিক ভিত্তি কী?

'ইয়াং-ইন্' মতবাদ। এই দর্শনে ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক অভেদ্য। মানুষ বিরাট বহির্ব্রহ্মাণ্ডেরই একটি ক্ষুদ্র প্রতিকৃতি। চৈনিক দর্শনে পাঁচ সংখ্যাটি অতি পবিত্র আর আশ্চর্য গুণসম্পন্ন একটা অলৌকিক সংখ্যা। পাঁচ ধাতু, পাঁচ ইন্দ্রিয়, পাঁচ রকম রং, পাঁচ রকম স্বাদ, ইত্যাদি এই সংখ্যার বিশেষত্বের একটি নমুনা। চৈনিক সৃষ্টি রহস্যে আর চিকিৎসা বিদ্যায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল স্ত্রী আর পুরুষের সম্পর্ক। স্ত্রী আর পুরুষ বিপরীত ধর্মী দুই গুণ, প্রথমটার নাম 'ইয়াং', দ্বিতীয়টার নাম 'ইন্'। নদীর জোয়ার-ভাঁটার মতো, সঙ্গীতের উত্থান-পতনের মতো, 'ইয়াং' আর 'ইন্' মানবদেহে সব সময়ে তরঙ্গায়িত হচ্ছে। এই তরঙ্গায়িত প্রবাহের গতি রুদ্ধ হলেই শরীরের বৈক্লব্য আর ব্যাধি আর রোধ করা যাবে না।

লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ সরকার

☐ গবেষণামূলক গ্রন্থমালা ☐

আদিবাসী সমাজ ও পালাপার্বণ ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ৪৫ টাকা, **পশ্চিমবঙ্গের লোকশিল্প ও শিল্পীসমাজ** তারাপদ সাঁতরা ১৩০ টাকা, **পশ্চিমবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী ও লোকবিশ্বাস** বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ টাকা, **বাউল ফকির কথা** সুবীর চক্রবর্তী ২৫০ টাকা, **বস্তুবাদী বাউল** শক্তিনাথ ঝা ২০০ টাকা, **বাংলার প্রাচীন মৃত্তিকা ভাস্কর্য** নীহার ঘোষ ৭০ টাকা, **লোকশিল্প বনাম উচ্চমার্গীয় শিল্প** ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ৬০ টাকা, **শিখীর দিসম রেয়াঃ সহরায় এনেচ সেরেঞ** সহদেব মুরমু ৭০ টাকা, **উত্তরবঙ্গের লোকনাটক ও জনজীবন** সুবোধ সেন ৯০ টাকা, **পশ্চিমবঙ্গের মৃৎশিল্প** দীপঙ্কর ঘোষ ১০০ টাকা।

☐ জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থমালা ☐

বর্ধমান ১৪০ টাকা, **মেদিনীপুর** ১৪০ টাকা, **হাওড়া** ৭০ টাকা।
বাঁকুড়া ১০০ টাকা, **নদিয়া** ১০০ টাকা।

☐ লোকসংগীত স্বরলিপি ☐

গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ (প্রথম খণ্ড) দিনেন্দ্র চৌধুরী ২০০ টাকা, **ভাওয়াইয়া গীতি সংগ্রহ ও স্বরলিপি** শ্যামাপদ বর্মন ৫০ টাকা, **গ্রামীণ গীতি সংগ্রহ** (দ্বিতীয় খণ্ড) দিনেন্দ্র চৌধুরী ২২৫ টাকা।

☐ লোকশিল্পী জীবনী গ্রন্থমালা ☐

কবিয়াল গুরুদাস পাল মালিনী ভট্টাচার্য ও প্রদীপ্ত বাগচী ৫০ টাকা, **চারণকবি গুমানী দেওয়ান** আবদুর রাকিব ১০০ টাকা, **ঝাকসু** শক্তিনাথ ঝা ২৫ টাকা, **আব্বাসউদ্দিন** আবুল আহসান চৌধুরী ১২০ টাকা।

☐ **লোকশ্রুতি** ☐ ১৩-২৫ ; ১৫, ১৭, ১৮, ১৯-৪০ ; ২০, ২১-৫০ **টাকা**।

☐ ক্যাসেট ☐

ঝুমুর ● লালনের গান ১ ও ২ ● ভাওয়াইয়া ● দিনেন্দ্র চৌধুরী মরমী গান ● সলাবত মাহাতোর ঝুমুর ● কালাচাঁদ দরবেশের দরবেশি গান ● দাশরথি রায়ের পাঁচালি ● জাতের নামে বজ্জাতি ও আমার জাত গেল রে ● প্রতিটির দাম ৩৫ টাকা ● **সাধু রামচাঁদ মুর্মুর গান ●** ২৫ টাকা।

কমপ্যাক্ট ডিস্ক (সি.ডি.) বাউল গান ● ঝুমুর ও ভাওয়াইয়া প্রতিটির দাম ১৫০ টাকা ।

প্রাপ্তিস্থান ■ কেন্দ্রের কার্যালয়, বাংলা আকাদেমি বইঘর, কফি হাউস বইঘর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, দে'জ, পুস্তক বিপণি, ককাতা বিশ্ববিদ্যালয় চীপ স্টোর, একুশে, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

মধুসূদন মঞ্চ, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৬৮, ফোন : ২৪২০-৭১১৬
ফ্যাকস : (০৩৩) ২৪২৩-৭৪৩৭, ই-মেল : loksanskriti@vsnl.com

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

স্মারক নং ৫৩১৫/২০০৩/তথ্য ও সংস্কৃতি

...রং করা পাথরের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল কাঁকড়া বিছে...কালো রঙ...
কিন্তু দাড়ার বদলে দুটো হাত...তুলতুলে হাতের আঙুলে ডগায় হীরের মত নখ!

দুঃস্বপ্ন দ্বীপ

শ্রীধর সেনাপতি

চৌরঙ্গীর এক হোটেলে ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয় আমার। স্বদেশভূমি জার্মানী থেকে বিশ্বপর্যটনে বেরিয়েছেন ক'বছর আগে। ঘুরতে ঘুরতে ভারতে এসে পৌঁচেছেন। কলকাতায় তাঁর অবস্থার মাত্র একদিনের জন্যে।

বিপুল অভিজ্ঞতার ঝুলি বহন করছেন ভদ্রলোক। তাঁর কথাবার্তা এবং গল্পের মধ্যে চূড়ান্ত পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লো। অল্প কথায় বিচিত্র স্বাদের অভিজ্ঞতার কাহিনীগুলো তাঁর মুখ থেকে শুনতে শুনতে এক সময়ে আমি বলে উঠলাম : আপনার হাতে সময় খুব বেশি নেই, বুঝতে পারছি। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সবিস্তারে কোন কাহিনী বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়, একথাও ঠিক। কিন্তু আমি যে তাতে তৃপ্তি পাচ্ছি না।

পর্যটক আমার মুখের দিকে চেয়ে হাসলেন : কত বড় কাহিনী শুনতে চান আপনি? বেশ, একটা কাহিনী বলি—শুনুন তাহলে। আফ্রিকার একটি অঞ্চলে স্থানীয় গভর্ণর-এর বাংলোর বাঁশের তৈরি বারান্দায় আমি বসেছিলাম। দৃষ্টি ছিল আমার সমুদ্রের দিকে।

হঠাৎ সমুদ্রতট থেকে একটা চিৎকার কানে এল : আহ্নি...আহ্নিরু !

গভর্ণর ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করে বললেন : শুনতে পেলেন কিছু?

বললাম : হ্যাঁ, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারলাম না। আহ্নিরু কী? কোন লোকের নাম? সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে তার নাম ধরে কি কেউ তাকে ডাকছে?

গভর্ণর আমার পাশে বসলেন। অতঃপর কিছুকাল নীরব থেকে তিনি এক কাহিনী শুরু করলেন:

আহ্নিরু ছিল...ওই লোকটির বন্ধু ছিল আহ্নিরু; মানুষের যে ওরকম একটি বন্ধু থাকতে পারে, আমার ধারণা ছিল না।

লোকটি নাবিক ছিল। টাকা পয়সা রোজগার করত দু'হাত ভরে। সমুদ্র থেকে ফিরে এসে যখন আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করতে যেত, তখন তার পরনে থাকত দামী পোশাক, পকেটে প্রচুর টাকা। আর পাঁচজন নাবিকের মত সে নেশাও করত। ক্রমে মদের মাত্রা তার বেড়ে উঠল। একমাত্র ঘুমন্ত বা অচৈতন্য অবস্থায় সম্ভব হত না বলেই, ওই সময়টুকু মদের বোতল তার হাতে থাকত না।

ফলে চাকরী আর কোথাও স্থায়ী হয় না। পুরানো চাকরী চলে যায়, আবার নতুন একটাকে ধরে। নতুন চাকরী পেলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চক চক করে মদ খায়। আর ওই দোষে চাকরী হারাবার সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধ হতে থাকে অনুতাপের আলোয়। অবস্থাটা একটু অনুমান করে নিন আপনি।

ওইভাবে জাহাজের মধ্যে দায়িত্বজ্ঞান হারিয়ে মাতলামো করার অপরাধে একটা নাম-না জানা দ্বীপের মধ্যে তাকে নামিয়ে দিয়ে একদিন জাহাজটা সরে পড়ল। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল এবং মনুষ্য সমাজ বহির্ভূত দিগ্‌সীমাহীন মহাসমুদ্রের সুদূর বুকে সে অঞ্চল অবস্থিত।

যখন নেশা কাটলো—নাবিকটি দেখলো, একটা কাঠের তৈরি রাস্তার ধারে সে একাকী পড়ে রয়েছে। পকেটে তার পয়সা নেই। চাকুরী চলে গেছে। উদর শূন্য।

বহুক্ষণই একই জায়গায় বসে রইল সে। বসে থাকতে থাকতে দূরে একটা রং করা পাথরের দিকে তার দৃষ্টি পড়ল।

কী ওটা? সে উঠে দাঁড়াতে চাইল।

সেই রং করা পাথরের আড়াল থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল একটা কাঁকড়া বিছে। বিছেটা নাবিকটির মুখে দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল ।

কাঁকড়া বিছের যে চেহারা দেখে এসেছে, এটার চেহারা সেরকম নয়। আকারে ছোটই। এবং রঙও কালো। কিন্তু দাড়ার পরিবর্তে এই কাঁকড়া বিছেটির দু'টি হাত আছে। নরম তুলতুলে হাতের ছোট্ট ছোট্ট আঙুলের ডগার হীরের মত নখ। এবং—হ্যাঁ, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, সন্ধিস্থল নেই।

নাবিকটি অনেকক্ষণ ধরে অবাক দৃষ্টিতে বিছেটিকে লক্ষ্য করছিল। এক সময়ে তাকে পথ থেকে সরিয়ে দেবার জন্যে মুখে একটা শব্দ করল : হিস্‌! হিস্‌!! সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রলয় কাণ্ড ঘটে গেল। সে হুমড়ি খেয়ে উপুড় হয়ে সেখানেই পড়ে গেল। পড়ে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তে কাঁকড়া বিছেটি যে দ্রুত বেগে সেখান থেকে সরে গেল, এটা লক্ষ্য করেছিল সে। তার কপালটা সেই রং করা পাথরটার গায়ে আঘাত পেল। সমস্ত আলোটুকু নিভে গেল তার চোখের সামনে থেকে।

দুই

নাবিকটি শরীরে খুবই শক্তি ধরত আগে। কিন্তু মদের নেশা তাকে শক্তিহীন করে তুলেছিল। চেহারায় কোন শ্রী ছিল না। মুখের চামড়া ঝুলে পড়েছিল। ফলে, নাসিকাটি তার উঁচু দেখাতো। চোখ দুটো সর্বদাই লাল হয়ে থাকত। শুষ্ক ত্বকের নিচে শরীরের মাংসপিণ্ডটা শিথিল হয়ে পড়েছিল। দীর্ঘকায় পুরুষ। দৈর্ঘ্যে অন্তত ছ'ফিট তিন ইঞ্চি। এবং দেহের ওজন তার একশো সাতাশ পাউণ্ড।

সেই কাঁকড়া বিছে দর্শন থেকেই শুরু। তারপর মাথায় আঘাত পাওয়াতে পূর্ণ শক্তিতে সেটা ক্রিয়াশীল। হ্যাঁ—একটা আতঙ্ক। আতঙ্কটা যেন হামাগুড়ি দিয়ে বেড়াচ্ছিল। যখন তার সংজ্ঞা আবার ফিরে এল, উঠে বসলো পথের ওপরে, তখন একটা সম্পূর্ণ নতুন জগতের মধ্যে নিজের অস্তিত্বটাকে খুঁজে পেল সে। জগতের অধিবাসীবৃন্দকে সে বুঝতে সক্ষম হল না। সাদা কোমল কেঁচোর মত কিলবিল করছে এমন সব জিনিস—তার পায়ের তলায় তাদেরই যেন কার্পেট পাতা রয়েছে। তার মাথার ওপরে যেন কোন দানবের ছায়া এসে পড়ল। একটা শব্দ ছড়িয়ে পড়ল বাতাসে।

সে চিৎকার করে উঠল। ছুটে পালাবার চেষ্টা করল। তার মনে হল, অশুভ কিছু একটা তার সঙ্গ নিয়েছে। অতিকায় মাকড়সা আর কীট পতঙ্গের ঝাঁক তার নজরে পড়তে লাগল।

অতি প্রখর সূর্যের কিরণ তার আর সহ্য হল না। হাঁটু মুড়ে এক জায়গায় বসে পড়ল সে। তার মনের মধ্যে কিসের যেন একটা শব্দ উঠল। মানসিক ক্লান্তিতে সে অবসন্ন হয়ে পড়ল।

রাত্রি এল। হিমেল রাত্রি।...

নাবিকটি আবার জেগে উঠল।

ভাঙা চাঁদ আর লক্ষকোটি তারা আকাশের গায়ে।

মরুভূমির মত, সমুদ্রোপকূলের বালুকাস্তূপ কোথাও কালো ভেলভেটে আবার কোথাও বা রূপোলী-চাদরে যেন ঢাকা পড়ে আছে। বিচিত্র জীবনের ভিড় জমে উঠেছে সেই সব জায়গায়। দিনের আলোর চেয়ে রাতের এই আলো-আঁধারির মধ্যেই যেন তাদের চরম বিকাশ ঘটেছে। কারণ, যেটা সে চোখে দেখতে পাচ্ছে না সেটাকে সে অনুভব করতে পারছে। সে যেন বুঝতে পারছে, সামনে অন্ধকারের মধ্যে একটা বাইসন সূঁচলো শিঙ উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে তার দিকে চেয়ে। তাকে আক্রমণ করার সুযোগ খুঁজছে। একটা হিংস্র নেকড়ের দাঁতের শব্দ, কানে শোনার চেয়ে শরীরের ওপরে তার দংশনের জ্বালা দিয়ে সে যেন উপলব্ধি করছিল বেশি রকম।

সে আর্তচিৎকার করে উঠল। শহরের সন্ধানে সে দৌড়ালো।

শহরে গিয়ে হাজির হল এক সময়ে। ধূলিমলিন পোশাক। শরীর ক্ষতবিক্ষত।

তার কানে এল—কে যেন বলছে : মাল্লা হতভাগার দিকে চেয়ে দেখ কিছু খেতে দাও ওকে।

তারা নাবিককে এক জায়গায় নিয়ে গেল। সেখানে তাকে আহার দিল। সে মদ খেতে পেল সেখানে। মদটুকু খাওয়ার পরে তার মনে হতে লাগল, আর কিছুক্ষণ ওইভাবে চললে, সে হয়তো মরেই যেত।

সে বিড়বিড় করে বকে চললো তাদের সঙ্গে।

তার কথা শুনে তারা আনন্দ পাচ্ছিল।

একটা দারুণ স্ফূর্তিতে তার নিজের মনটাও উড়ু উড়ু করছিল খুব। কিন্তু অল্পকাল পরেই সে বুঝতে পারল—সেখানে সে একাই পড়ে আছে। তার আশেপাশে কেউ নেই। তারা তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গেছে।

মদ্যশালাটি বন্ধ করার সময় হয়েছিল বোধ হয়। মালিক নাবিকটিকে তুলে পথের ওপরে ফেলে দিল।

পথের ওপরে তখন কেউ নেই। কিছু ইঁদুর আর ঝাঁক ঝাঁক মাছির দেখা পেল সে।

ইঁদুর—হ্যাঁ, সে দেখতে পেল, এ ইঁদুরগুলোর দুটো করে পা হয়েছে। মানুষের মত পোশাক পরা। গলায় টাই ঝুলছে।

এই দু'পা-ওলা একটি ইঁদুরের নাম জিলিও। ছোট, শ্যামবর্ণ তেলতেলে চেহারা। বাঁকা নাকের নিচে একজোড়া পরিপুষ্ট গোঁফ।

জিলিওর দৃষ্টি নাবিকটার ওপরে গিয়ে পড়ল। অতঃপর সে দোকানের মালিকের কাছে গিয়ে বলল : এই ভদ্রলোককে আরও একটু মদ দাও। আমি দামটা দিয়ে দিচ্ছি।

একটা সস্তা দামের হুইস্কির সঙ্গে অন্য একটা ছোট বোতলের দু'ফোঁটা তরল পদার্থ মিশিয়ে জিলিওর হাতে তুলে দিল সে। জিলিও সেটা নাবিককে এনে দিল। নাবিকের কাঁধে হাত রেখে পাশে বসে পড়ল।

সস্নেহে বলল : খেয়ে নাও।

নাবিক জিলিওর মুখের দিকে তাকালো।

: খাও। জিলিও আগের সুরেই বললো।

নাবিক সে অনুরোধ রক্ষা করলো।

: তুমি জাহাজের নাবিক, তাই না?

সে ঘাড় নেড়ে বললো : হ্যাঁ।

সারা শরীরটা তার ঝিম ঝিম করছিল। ঘাড়ের কাছে যেন যন্ত্রণাবোধ করছিল একটা। তার চেতনটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছিল।

জিলিও তাকে লক্ষ্য করলো কিছুকাল। মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো।

দোকানের মালিক জিজ্ঞাসা করলো : এই মানুষটাকে নিয়ে কী করবে এখন?

জিলিও নাবিকের পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে বললো : পেয়েছি। এর পরিচয়পত্র এর পকেটেই আছে।

কাগজপত্র কিছু বেরুলো তার পকেট থেকে। জিলিও সে সব ঘেঁটে ঘেঁটে দেখতে লাগলো, তারপরেই খুশি খুশি গলায় বলে উঠলো : এ যে দেখছি, নাবিক হওয়ার সব গুণের অধিকারী। বাঃ বাঃ। একেই আমার প্রয়োজন।

তিন

নাবিকের নেশার ঘোর কাটলো, তখন সে বললো, তার বহু পরিচিত পরিবেশের মধ্যেই আবার এসে পড়েছে সে। চোখ দুটো খোলার তার প্রয়োজন হল না। তার নাক এবং স্পর্শশক্তি তাকে জানিয়ে দিল–সে কোথায় আছে।

একটা সঙ্কীর্ণ বিছানার ওপরে সে শুয়ে ছিল। তার নিচে পাতলা স্প্রিংগুলো সব সময়ে কাঁপছিল।

অবশেষে সে চোখ খুললো। চারপাশটা খুবই নোংরা। বীয়ারের খালি বোতল জমে আছে অনেকগুলি। ছেঁড়া মোজা, পোড়া সিগারেটের টুকরো, কাগজ, ধুলোবালি–কী নেই সেখানে? বাণিজ্য-পোতের নাবিকদের আবাসস্থলের চেহারা যেমনটি হওয়া উচিত, সেইরকমটিই দেখা যাচ্ছে।

সে আবার চোখ বুজলো। নিজের মাথাটাকে দারুণভাবে ঝাঁকিয়ে নিলে একবার। অসম্ভব দৃশ্য দেখার হাত থেকে যদি মুক্তি পাওয়া যায় এর ফলে–তাই এই চেষ্টা আর কি। সে যে কোন জাহাজের ওপরে উঠেছে, একথাটা তার স্মৃতিতে আসছিল না। সে শুধু জানতো, সমুদ্রের ধারে সে পড়েছিল এবং কতকগুলো অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটে গেছে সেই সময়টুকুর মধ্যে।

সুতরাং–দু'চোখ বুজে মাথাটা ঝাঁকিয়ে নিল সে। ফলে, মাথার মধ্যে তীব্র একটা যন্ত্রণা অনুভব করল। উঁ-হু। যন্ত্রণাটার উপশম যতক্ষণ পর্যন্ত না হল, ততক্ষণ পর্যন্ত সে নিথর হয়ে পড়ে রইল।

খুব সাবধানে আবার সে চোখ খুললো। হ্যাঁ, সে একটা জাহাজের মধ্যেই রয়েছে।

: এই! দুর্বল কণ্ঠে সে ডাকলো একজনকে।

লোকটা কাছে এল।

সে শুধলো : আমি কোথায়? য়্যাঁ–আজ কী বার?

: মঙ্গলবার। সে সতর্ক গলায় বললো : জিলিও তোমাকে এই জাহাজে তুলে দিয়েছে। কোনদিন এখান থেকে আর মুক্তি পাবে না তুমি। এদের জন্যে পশুর মত খাটতে হবে। বদলে তুমি কিছুই পাবে না।

লোকটি চকিতে তার কাছে থেকে সরে গেল।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো নাবিকটি। পালাতে হবে এখান থেকে। এই দাসত্ব থেকে মুক্তিলাভ করতেই হবে।

সুযোগের অপেক্ষায় থাকে সে। অশুভ কিছু একটা যেন অদৃশ্য থেকে তাকে অনুসরণ করছে–এমনি একটা অনুভূতি সারাক্ষণ তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সেই অশুভ শক্তি তাকে খুন করতে পারে। রাত্রির গভীর অন্ধকারে, জাহাজ থেকে সে সমুদ্রে ঝাঁপ দিল একদিন।

দিক্‌ চিহ্নহীন গাঢ় কালো পাথার। সে তার বুকে পড়ে সাঁতার দিতে লাগলো। কোথায়, কোন্‌দিকে সে যাবে জানে না। বাঁচতে হবে–এইটুকুই জানে। এবং তার জন্যে যা করা উচিত, সে তাই করবার চেষ্টা করে। জলের ওপরে নিজের শরীরটাকে সে ভাসিয়ে রাখে।

নাবিকটি বলেছিল, ওইভাবে পাঁচ-সাতটা দিন কাটিয়ে দিয়েছিল সে। তারপর ভেসে আসা একটা কাঠের টুকরোকে আশ্রয় করে, ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে, বায়ুতাড়িত হয়ে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে গিয়ে উঠেছিল।

দ্বীপটি–বালি আর পাথরের ছোট্ট একটা স্তূপের মত। মাঝখানটা উঁচু হয়ে উঠেছে। নানান শাকসব্জিতে ভরা এবং সমুদ্র পাখিদের কলকূজনে মুখরিত। সেই দ্বীপের দিকে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চেয়ে বসেছিল। দৃষ্টিতে কোন রকম কৌতূহল বা আগ্রহ ফুটে ওঠেনি। সেই দ্বীপের মধ্যে তার পৌঁছনোর অর্থ সে যেমন বোঝেনি, তেমনি সে অতঃপর কী করবে তাও তার ধারণার বাইরে ছিল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। যখন ঘুম ভাঙলো, সে দেখলো, সূর্য উঠেছে।

তার সমস্ত শরীর যেন দুর্বলতায় ভেঙে পড়ছিল। মাংসপেশীগুলো যেন শুকিয়ে উঠেছিল। জিভটা ভেতর দিকে টানার ফলে শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল একটু। সে হাতে এবং হাঁটুতে ভর দিয়ে দ্বীপের ঢালু পাড় বেয়ে ওপরে উঠলো।

এবার একটু আরামবোধ করতে লাগলো সে। তার মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছে–বুঝতে পারছিল সেটা। আশেপাশের সব কিছুর সম্বন্ধে ভিন্ন একটা অনুভূতিবোধ জন্ম নিচ্ছিল তার মধ্যে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যে বিভ্রান্তিকর দৃশ্য এবং আতঙ্ক তাকে ঘিরে রেখেছিল, এখন–এই মুহূর্তে পুনরায় সেগুলোর মুখোমুখি হওয়ার বাসনা জাগছিল তার মনে। একটা জিঘাংসা শরীরের রক্তটাকে তোলপাড় করছিল। সে চাইছিল, কিছু একটা এসে তাকে আক্রমণ করুক। সে আক্রমণকারীকে হত্যা করবে–ছিন্নভিন্ন করে দেবে।

হাতের কাছে একটা নারকেল পেল সে। একটা পাথর দিয়ে নির্মমভবে সেটাকে আঘাত করতে লাগলো। সেটাকে ফাটিয়ে ভেতরের জলটুকু পান করলো। তারপর ভেঙে ভেতরের শাঁস দিয়ে উদরপূর্তি করলো সে। অত্যন্ত সুখী মনে করলো নিজেকে।

তার চারপাশের জমি–কোথাও উঁচু, কোথাও বা টোল খাওয়া। এবং সেই ছোট ছোট টোল খাওয়া জায়গা থেকে এক রকম অদ্ভুত গাছ জন্ম নিয়েছে। আকৃতি ডাঁটার মত–যেন দুটো রবারের আবরণের মধ্যে থেকে দু'টো ডাঁটা পরস্পরকে পেঁচিয়ে জড়িয়ে রয়েছে। ডগাটা শেষ হয়েছে শামুকের চোখের মত থলথলে, শাঁসালো দুটো অংশে গিয়ে।

সে ওই রকম একটা গাছের কাছে এলো। ডাঁটার গায়ে হাত ছোঁয়ালো। সঙ্গে সঙ্গে একটা মোচড় খেয়ে তার কাছ থেকে সরে গেল

গাছটা। অন্ধের মত মাটির ওপরে আছাড় খেতে লাগলো। কোন একটা কিছুর সন্ধানে ইতস্তত নড়াচড়া করতে লাগলো সেটা।

নাবিকটি এ ধরনের জিনিস কল্পনাও করতে পারেনি আগে। কিন্তু গাছগুলোর কাছ থেকে ভয় পাবার মত কোন কারণ যে নেই, এ বিষয়ে সে যেন স্থির নিশ্চিত হল। অবহেলা ভরে একটা গাছকে সে পা দিয়ে সরিয়ে দিল তার সামনে থেকে। গাছটি পলকের মধ্যে সাপের মত নাবিকের মাথার ওপরে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। তারপর আছাড় খেয়ে পড়লো মাটিতে।

সেদিকে আর ঘুরে দেখলো না নাবিকটি। কেন দেখবে? কারণ, ওটা যে তার কল্পনা।

ওই একটা ভুল করলো সে? জিনিসটা কল্পনা নয়—বাস্তব। হ্যাঁ, বন্ধু! যেমন আর আমি!

চার

নাবিকটি তখন এটা উপলব্ধি করতে পারেনি।

কারণ, সেই গাছের মোচড় খাওয়া ডাঁটাগুলো তার কল্পনার সৃষ্ট জিনিসের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে তাকে ঘিরে যেন নৃত্য করতে শুরু করেছিল। অর্থহীন শব্দ শুনছিল সে দু'কান ভরে।

ডাঁটাগুলো অনিষ্টকর নয় মনে হল।

নাবিকটি পাহাড়ের ওপরে গিয়ে উঠলো। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে জোরে শ্বাস টানলো। একটা পূতি-গন্ধ নাকে এল তার। পছন্দ হল না। এরকম গন্ধের উৎসটা কোথায়—জানবার আগ্রহ তার নেই। আসলে, গন্ধটাকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনলো না। সে পাহাড় বেয়ে উঠতে লাগলো।

পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে, কপালের ঘাম মোছবপার জন্যে মুহূর্তকাল দাঁড়ালো সে। দূর দিগন্তে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল। অন্য দ্বীপ তার দৃষ্টিপথে এল না।

এই দ্বীপটি—আকারে ছোট। প্রায় গোল। দুটি ঝর্না নজরে পড়লো। একটা ঘন সন্নিবিষ্ট নারকেল কুঞ্জ দেখে দারুণ উৎসাহবোধ করতে লাগলো সে।

সেই দুর্বোধ্য গন্ধ নিয়ে এক ঝলক হাওয়া ছুটে এসে পাহাড়-চুড়োর দিকে নাবিকের মনোযোগ আকর্ষণ করলো। চুড়োটি আগ্নেয়গিরির মুখের মত। সেখানে একটা নিম্নমুখী গহ্বর রয়েছে। এবং পূতি-গন্ধটা—নাবিক বুঝতে পারলো—ওরই ভেতর থেকে আসছে।

সে নিম্নমুখী গহ্বরটির ঢালু গা বেয়ে ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করলো। মধ্যপথে পৌঁছনোর সঙ্গে সঙ্গে দুটো থল্‌থলে শাঁসালো ডাঁটা গর্তের ভেতর থেকে ওপর দিকে উঠে পড়লো। দেখতে দেখতে প্রায় বিশ ফিট শূন্যে উঠে গেল সে দুটো। তারপর বাইরের দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করলো। একটা এলো নাবিকটার দিকে। অপরটি গর্তের মুখটাকে অতিক্রম করে গেল। তারা ক্রমশ মোটা হয়ে পড়তে লাগলো।

নাবিকটি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখছিল। নিজেকে তৈরি করে নিচ্ছিল—ডাঁটাগুলোর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে। সে সজোরে এক থাবা বসালো একটি ডাঁটার গায়ে। সেটা ছটফটিয়ে উঠলো। আবার আঘাত হানলো। দুটো ডাঁটাই এবার সঙ্কুচিত হয়ে গর্তের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে চাইলো। নাবিক তাদের অনুসরণ করতে গেল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সপাৎ করে চাবুকের মত একটা ডাঁটা এসে পড়লো নাবিকের গায়ে।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল নাবিকটি। আবার সে আঘাত পেল। আবার—আবার।

শূন্যে উঠে ফিকে সবুজ উজ্জ্বল থলথলে সেই ডাঁটা কাঁপতে লাগল থর থর করে। সূর্যের কিরণ লেগে মসৃণ হয়ে উঠেছে।

এবং পলক পড়তে না পড়তে অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে গর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

পাহাড়ের গহ্বর থেকে নাবিকটি বেরিয়ে এলো। বাইরে ওই ধরনের একটি গাছও নজরে পড়লো না তার।...

নারকেল কুঞ্জের মধ্যে পড়ে পড়ে গভীর ঘুমের ভেতর দিয়ে রাত্রিটা কাটিয়ে দিল সে। এলোমেলো অনেক স্বপ্ন দেখলো। কিন্তু কোন স্বপ্নই তার বিরক্তি উৎপাদন করতে পারলো না। সে যেন উপলব্ধি করতে পারছিল যে, কোন কিছুর প্রতি অহেতুক ভয়কে সে জয় করে নেবার অধিকার একটু একটু করে অর্জন করে নিতে পেরেছে।

সকালে আচমকা সে উঠে বসলো।

তবে পায়ের কাছে কতকগুলো নারকেল পড়েছিল। তাকে পরিবেষ্টন করে রয়েছে একটা জঙ্গল—দোলায়মান ডাঁটার প্রাচীর।

সোজা হয়ে দাঁড়ালো সে। কোমর থেকে একটা ছুরি বের করলো। চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো সেই বিচিত্র গাছের জীবন্ত ডাঁটার তৈরি দুর্গের দিকে। তবুও সে আতঙ্কগ্রস্ত হয়নি। একটা গভীর শ্বাস নিল সে। তারপর সদর্পে দুর্গপ্রাচীরের দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু নিকটবর্তী হওয়ার আগেই মাটির সঙ্গে যেন গলে মিশে গেল সেই দণ্ডদুর্গের প্রাচীরটা।

নাবিকটা থমকে দাঁড়ালো। মনে মনে খুশি হয়ে বললো : ওরা যদি আমার সঙ্গে এরকমই ব্যবহার করে, তাহলে আমার কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়।

সে একটা নারকেল ভেঙে খেল। এই সময়ে দেখতে পেল—কিছুটা তফাতে আবার কয়েকটা ডাঁটা মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়েছে। যেন, সেখান থেকে লক্ষ্য করছে তাকে।

নাবিকটার মাথার মধ্যে অবিরত একটা তরল গুঞ্জনধ্বনি জেগে থাকছিল। একটা বিস্ময়কর ভাষায় হাজার মানুষ যেন কথা বলছিল তার মগজের মধ্যে।

এটাকে বড় বেশি গ্রাহ্যের মধ্যে সে আনতে চাইছিল না।

ডাঁটাগুলোর দিকে আবার সে ছুটে গেল। অদৃশ্য হয়ে গেল সেগুলো। অন্যদিকে সঙ্গে সঙ্গে আর একদল দাঁড়িয়ে পড়লো মাথা উঁচু করে। সংখ্যায় ক্রমশ বাড়তেও থাকে। তার পায়ের নিচে থেকেও কতকগুলো বেরিয়ে পড়লো। সে চমকে, লাফিয়ে উঠলো। একটু

অস্বস্তিবোধ করতে লাগলো সে। তার মনে হল, গাছগুলোর মধ্যে কিছুটা যেন একগুঁয়েমির ভাব রয়েছে।

তাদের পেছনে রেখে সে ভিন্ন মুখে এগিয়ে যেতে লাগলো।

কিন্তু ডাঁটাগুলোও তার পেছনে চললো। ভিড় বাড়তে লাগলো তাদের। নাবিকের পেছনে ফেলে রেখে যাওয়া পদচিহ্ন ভেদ করে নতুন নতুন গাছ বেরিয়ে আসছিল।

নাবিকের মগজের মধ্যের গুঞ্জনধ্বনিটা একটা উৎফুল্ল কর্কশ ধ্বনি হয়ে যেন এবার ফেটে পড়লো।

সমস্ত দ্বীপময় সে ঘুরে বেড়ালো সেই ফিকে সবুজ ডাঁটার দলকে পিছনে নিয়ে। ডাঁটাগুলো তার কোনরকম ক্ষতি করার চেষ্টা করলো না। কিন্তু—তারা তাকে পাহাড়ের দিকে যাওয়ার জন্যে যেন বাধ্য করতে লাগলো।

নাবিকটি এই সময়ে খুবই অস্থির ছিল। অপর কোন মানুষের পক্ষে তার অবস্থাটা উপলব্ধি করা সহজ নয়। তার ভগ্ন মনের সুচতুর সতর্কতা, নিজেকে রক্ষা করার অলৌকিক ক্ষমতা এনে দিয়েছিল। তার কল্পনার জগত আর তার নিজের কাছে চমকপ্রদ নয় তখন। যদি আপনাকে বা আমাকে হঠাৎ ওই দ্বীপের মধ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হত, তাহলে—একটা গরিলাকে শহরের জনবহুল রাস্তায় ছেড়ে দিলে বা শহরের কোন মানুষকে আফ্রিকার জঙ্গলে নির্বাসন দিলে তার মনের যে অবস্থা হবে, আমি তার কল্পনা করতে পারতাম কিছুটা। সমস্তটাই সইয়ে নেওয়ার ব্যাপার।

সুতরাং নাবিকটা এক সময়ে দেখলো যে, সে সেই পাহাড়ের চুড়োর ওপরে গহ্বরটির কাছে গিয়ে পড়েছে।

সেখানে অনুচরবর্গ নিয়ে প্রকাণ্ড দৈত্যাকার জিনিসটি তার জন্য অপেক্ষা করছিল। বৃহৎ দুটি সবুজ ডাঁটার একটি নাবিকের মাথার ওপরে সর সর করে উঠে গেল। তারপর চাবুকের মত এসে আঘাত করলো নাবিকের শরীরে।

সে পাশে দিকে সরে গেল একটু। ডাঁটাটা পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়লো। নাবিক ছুরি নিয়ে আক্রমণ করতে গেল সেটাকে। সেটা গহ্বরের দিকে সরে গেল। প্রকাণ্ড শরীর—নাবিকের কাছ থেকে গহ্বর পর্যন্ত প্রায় ষাট ফিট দৈর্ঘ্য নিয়ে পড়ে আছে। এবং গহ্বরের মধ্যে শরীরের কত অংশ লুকিয়ে রেখেছে—নাবিক তা অনুমান করতে পারলো না।

নাবিক পুনরায় সেটাকে আক্রমণ করতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার পাশে ক্ষুদ্র একটা ডাঁটার আবির্ভাব হল। চকিতে নাবিকের একটা পা সাপের মত সেটা জড়িয়ে ধরলো।

নাবিকটি গড়িয়ে পড়লো মাটিতে। এবং নিজেকে সামলে নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পেলো—সেই বিচিত্র ছোট ডাঁটার মত গাছটি যেন সমূলে উৎপাটিত হয়ে পড়েছে এখন। মূলটির রঙ গাঢ় সবুজ। পাঁচ-ছ'ফুট লম্বা। মধ্য ভাগের ব্যাস প্রায় আড়াই ফিটের মত। একটা চটচটে জিনিসের আবরণে মূলের রুক্ষ অংশটা ঝিকমিক করছে।

কিন্তু—যে জিনিস দুটোকে এতক্ষণ সবুজ বৃহৎ ডাঁটা বলে মনে হচ্ছিল, সে দুটো তো কোন গাছের অংশ নয়। নাবিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো। হ্যাঁ, শুঁড়ের মত দুটো জিনিস। গাছ নয়—জীবন্ত এক বিচিত্র প্রাণী। ছোট ডাঁটার মত প্রাণীটিকে সেটা উদরস্থ করে ফেললো।

নাবিকটি এবার ভয় পেল। ছিটকে দূরে সরে গেল একটু। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলো, সে প্রাণীটা আস্তে আস্তে পুনরায় পাহাড় চুড়ার গহ্বরের মধ্যে লুকিয়ে পড়ছে।

কী জন্তু এটা, নাবিকটি ঠিক জানে না।

কিন্তু আমি অনেক অনুসন্ধানের পর প্রাণীটির পরিচয় কিছুটা যেন আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম। আমার মনে হয়, সামুদ্রিক কীটের এক জাত—একিউরোইডিয়া (Echiuroidea)-র একটি। বোনেলিয়া ভিরিডিস (Bonellia Viridis)-ই হবে। যেখানেই জন্ম হোক, আকারে ক্রমে ক্রমে বেড়ে ওঠে। শুঁড় সমেত চার ফিটের বেশি লম্বা এজাতের কোন প্রাণীর কথা জানা ছিল না।

পাঁচ

নাবিকটি মনে মনে এমন একটা আশ্রয় খুঁজছিল, যেখানে ওই সব জিনিসগুলো তার বিরক্তি উৎপাদন করতে আসবে না।

একটা জায়গা তার পছন্দ হল। সেখানে শরীরটাকে এলিয়ে দিল সে।

কিন্তু—ধীরে ধীরে, তারপর দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে তার চারপাশে আবার সেই রকম ডাঁটার মত প্রাণীদের আবির্ভাব হতে দেখা গেল।

আঃ! চিৎকার করে উঠলো নাবিকটি : সরে যাও! সরে যাও।

আর, কী আশ্চর্য! সঙ্গে সঙ্গে তারা দূরে সরে গেল।

বিস্ময়ে কিছুকাল হতবাক হয়ে গেল নাবিকটি। অনেকদিন—অন্তত কয়েক সপ্তাহ পরে, এই প্রথম মানুষের প্রতিক্রিয়া অনুভূত হল তার শরীরে। এমন তুলনাহীন, কৌতূহল-উদ্দীপক প্রাণীদের তার আজ্ঞাবাহী হয়ে পড়ার প্রমাণ দেখে, মানুষের ভেতরের সুপ্ত কৌতূহলবোধটি হাসিতে উচ্চকিত হয়ে যেন ফেটে পড়লো।

: এই—!

আচমকা হাসিটা থেমে গেল নাবিকটার। সে এদিকে ওদিক তাকালো। কে-কে কথা বলে? শব্দটা কোন নির্দিষ্ট দিক থেকে আসেনি। অন্তত তার মনে হতে লাগলো, কোন দিক থেকে নয়—তার নিজের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এসেছে শব্দটা। কিন্তু সে নিজে তা উচ্চারণ করেনি।

কে কথা বললে? নাবিক শুধলো।

: আমি। কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

নাবিক আবার এদিক ওদিক তাকাতে লাগলো। তার বাঁদিকে, মাটিতে যুগপৎ সর্বত্র বর্তমান ডাঁটাগুলোর সংলগ্ন একজোড়া শুঁড়ের দিকে নজর পড়লো।

সেদিকে আঙুল নির্দেশ করে নাবিক শুধলো : তুমি?

প্রাণীটা দু'ফিট উঁচুতে উঠে পড়লো। শূন্যে দুলতে দুলতে বললো : হ্যাঁ।

: কে তুমি?

: তুমি কী? প্রাণীটাও শুধলো নাবিককে।

নাবিক বললো : মানুষ।

: আমিও। তোমার জন্যে তোমার নাম মানুষ। আমার নামও আমার জন্যে মানুষ। তোমার জন্যে আমার কোন নাম নেই।

নাবিকটি তো তো করে বললো : তুমি একটা দুঃস্বপ্ন।

: খুব ভাল কথা। প্রাণীটা বললো : এখন থেকে আমরা দুঃস্বপ্ন রূপেই পরিচিত হব। সবাইকে জানিয়ে দেব আমি।

: তুমি আমার সঙ্গে কী করে কথা বলছো?

: আমার মন তোমার মনের সঙ্গে কথা বলছে।

: সত্যি? নাবিক শুধু এই কথাটাই বলতে পারলো।

প্রাণীটা শুধলো : তুমি কি করতে চাও?

: তার মানে?

: পাহাড় চুড়োর গহ্বরের সেই বিশাল প্রাণীটাকে তুমি যে মেরে ফেলতে পারো, আমরা বুঝতে পেরেছি। একটু তাড়াতাড়ি ওই কাজটা করতে পারো না?

: আমি কী করতে পারি?

: তুমিই পারো। তোমার শক্তি অনেক।

নাবিক তখন মনে মনে এক ফন্দী আঁটলো। যদি তাই করতে পারে সে, তাহলে এই প্রাণীগুলো তো তার কেনা গোলাম হয়ে যেতে পারে। লক্ষণটা যেন সেইরকমই।

সে উৎসাহ পেয়ে বললো : বেশ। তোমাদের সঙ্গে আমি একটা চুক্তি করবো। তার আগে আমাকে কিছু খেতে দাও।

ডাঁটাটি বললো : এখনি ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

নাবিকের মগজের মধ্যে টেলিপ্যাথিক সঙ্কেতের স্বন্ স্বন্ ধ্বনি জেগে উঠলো।

দু'তিন ডজন ডাঁটার মত জিনিস মাটি ভেদ করে লাফিয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

: প্রভু কিছু খেতে চায়। খবর পাঠাও। এখন থেকে আমরা দুঃস্বপ্নরূপে পরিচিত হব। এটাই প্রভুর ইচ্ছা।

ডাঁটাগুলো দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আগের প্রাণীটা নাবিকের কাছ থেকে সরলো না।

নাবিক সেটাকে জিজ্ঞাসা করলো : আচ্ছা, আগে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলোনি কেন?

: তোমার মতলবটা জানতে পারছিলাম না। দুঃস্বপ্নটি বললো : তাছাড়া, তোমার বুদ্ধির দৌড়টুকুও আস্তে আস্তে পরখ করে দেখছিলাম আমি।

: এখন আমার সম্বন্ধে তোমার সব জানা হয়ে গেছে, কেমন?

: হ্যাঁ, প্রভু।

: কিন্তু, তুমি ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে কথা বলে না কেন?

: অন্যান্যদের সঙ্গে আমার একটু প্রভেদ আছে। পাখিগুলোকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?

নাবিক তার মাথার ওপরে উড়ন্ত গাংচিল আর বকের ঝাঁক দেখতে পেল।

: হ্যাঁ।

দুঃস্বপ্নটি একটি বিচিত্র টেলিপ্যাথিক হুইলস্ ছিল। পাখিগুলো পাক খেয়ে নিচের দিকে নেমে এল। মুহূর্তের মধ্যে জায়গাটা ভরে উঠলো পাখিদের ভিড়ে।

নাবিকটি একটা বড় পাখিকে হাত দিয়ে ধরে ফেললো। আর সঙ্গে সঙ্গে পাখিটার ঘাড়টা দিল মটকে।

দুঃস্বপ্নের সঙ্কেত পেয়ে অন্য পাখিরা উড়ে পালিয়ে গেল।

: পাখিটাকে তুমি ওভাবে মারলে কেন?

: তুমি পাখিদের মাংস খাও নাকি?

: কেন খাবো না?

: তুমি যা চাও, সবই পাবে। কিন্তু আমি যা বলছিলাম—অন্যান্যদের সঙ্গে আমার প্রভেদ আছে। আমি একাই কেবল পাখিদের ডাকতে পারি। তোমার সঙ্গেও আমি একাই কথা বলতে পারছি, দেখছো তো।

: হ্যাঁ, আচ্ছা, পাহাড়ের গহ্বরের ওই বিশাল প্রাণীটা এল কোথা থেকে?

: ওটা—আমাদেরই একজন ছিল। কিন্তু খুবই বোকা। নিজের জাতের প্রাণীদের ধরে ধরে খায় ওটা। আমরা তা করি না। ও বৃদ্ধ হয়েছে। আমাদেরই কারোকে না কারোকে পেটে পুরেছে আর ওইভাবে অতিকায় হয়ে পড়ছে দিন দিন। পাহাড় চুড়োর ওই গহ্বর ছেড়ে ওটা আর কোথাও যেতে পারে না। কিন্তু যতই ওর শরীর বাড়ছে, ততই দূরের দিকে এগোতে পারছে। যদি তুমি ওটাকে হত্যা না করো, তাহলে সমস্ত দ্বীপটা ওর নাগালের মধ্যে একদিন এসে যাবে, আমাদের রাস্তাও হয় তো বন্ধ করে দিতে পারে।

: রাস্তা? কোন রাস্তা তো আমি দেখতে পাচ্ছি না।

: আছে। মাটির নিচের রাস্তা। সমস্ত দ্বীপটাই ওর রাস্তায় সঙ্গে মৌচাকের মত হয়ে গেছে। মাটির ওপরে শুঁড় ছাড়া আমাদের শরীরের বেশি অংশ কখনও দেখতে পাবে না। শুঁড়ের সাহায্যে ওইভাবে আমাদের আহার সংগ্রহ করি, পারিপার্শ্বিক অবস্থাটা বুঝতে

পারি। খুব দ্রুতগতিতে গর্ত খুঁড়তে পারি আমরা। এই যে প্রভু, তোমার খাবার এসে গেছে।

নাবিক দেখলো, নারকেলের শাঁস জল নিয়ে এক দল উঁটা হাজির হয়ে গেছে।

: জিনিসগুলো আমাদের মাটির নিচের রাস্তা দিয়ে আনা হয়নি, প্রভু।

: কেন? নাবিক কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করলো।

: কারণ, জিনিসগুলো তাহলে তোমার আহারের উপযোগী থাকতো না। তুমি সূর্যের আলোর মধ্যে বাস করো। এবং এগুলোও সূর্যের আলোর ভেতরেই জন্মেছে।

নাবিক হাত বাড়িয়ে তাদের কাছ থেকে সেগুলো নিলে। চমৎকার ঠাণ্ডা জল। দু'-এক চুমুক খেয়েই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে উঠলো : এ জিনিস কি খাওয়া যায়?

: তবে তুমি কি পছন্দ করো, প্রভু?

: হুইস্কি। জিন, রাম—বিয়ার।

উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে নাবিকের তৃষ্ণা যেন আরও বেড়ে গেল। কী চিৎকার করে বললো : দাও, দাও। আছে? কী নাম তোমার?

: আহ্‌নিরু! কিন্তু প্রভু, ওসব জিনিস তো আমাদের কাছে সেই।...

: গভর্ণর। আমি একটা হিসাব ধরিয়ে বলেছিলাম : একজন মাতালের কথায় এর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা যায় কি? অতিকায় সামুদ্রিক কীট—বুদ্ধিমান প্রাণী। তার সঙ্গে কথা বলেছে। আমাদের হিসাবের ভিত-টা অটুট থাকতে চায় কি গভর্ণর?

গভর্ণরের হাতে একখানা বই ছিল। থিওডোর স্টারজিওনের 'বিয়োণ্ড'। বইখানা পাশে নামিয়ে রেখে একটু হেসে বলেছিলেন একটু ভিন্নভাবে চিন্তা করলে, ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য বলেই মনে হওয়া উচিত। হোক না সামুদ্রিক কীট। বুদ্ধিমান কেন হবে না? বুদ্ধিমান বলতে কী বোঝায় বলুন।

আমি একটু অস্বস্তির সঙ্গে বলেছিলাম : বুদ্ধিবৃত্তি আমাদেরই আছে এবং সেটা আছে বলেই গ্রহের মধ্যে আমরা উন্নততর জীব।

: সত্যিই কী তাই? একটা হাতির ক্ষমতা আমরা আমাদের শরীরে ধরতে পারি? কিংবা, একটা কৃষ্ণসার মৃগের যে ক্ষিপ্রতা আছে, আমাদের মধ্যে তা কোথায়? তবু দৈহিক শক্তি বা গতি জীবের শ্রেষ্ঠত্বের সঙ্গে সম্পর্কহীন, একথা আমি স্বীকার করি। আমাদের বুদ্ধি যন্ত্রপাতি তৈরিতে ব্যবহার করছি আমরা।

আমি প্রশ্ন না করে থাকতে পারলাম না : যন্ত্র বা হাতিয়ার তৈরিই কি বুদ্ধি?

গভর্ণর মাথা নেড়ে বলেছিলেন : না, বুদ্ধিকে কাজে লাগানোর এ একটা উপায়।

: নাবিকের বর্ণিত এই কীটগুলোর সম্বন্ধে আপনি কী বলেন? তাদের শহর কারখানা নেই ; সাহিত্য সংস্কৃতি গড়ে ওঠেনি কেন?

: তাদের প্রয়োজন হয়নি। দ্বীপটার মধ্যে তারা সংখ্যায় অতিরিক্তভাবে সমাবিষ্ট নয়। তাদের সকলের আহারের জন্যে প্রচুর খাদ্য আছে। তাদের একমাত্র ভীতির কারণ এই অতিকায় প্রাণীটা। কিন্তু তবুও তার একান্ত কাছাকাছি গিয়ে না পড়লে তারা কেউ বিপদে পড়ে না। অতএব সেটা আরও বিশ হাজার বছর বেঁচে থাকলেও তাদের খুব বেশি ক্ষতি হচ্ছে না। সেটার উপস্থিতি তাদের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। তাদের সাহিত্য সংস্কৃতির কথা বলছেন? সে সম্বন্ধে আমরা কীভাবে ওয়াকিবহাল হব। নাবিকটা একেবারে নিম্নস্তরের—নির্বোধ ব্যক্তি। আহ্‌নিরু এবং তার স্বজাতিরা কী উজ্জ্বল ব্রেণের অধিকারী, নাবিকটি তা বোঝবার চেষ্টা করেনি। তাদের নিজস্ব বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে কোন কোন দিকে তারা নিশ্চয়ই উন্নতি করেছে। সেসব অনুসন্ধান করে দেখার মত আগ্রহ এ নাবিকটির ছিল না। অতএব, আপনি কোন জাতির পোশাক, যানবাহন, খাদ্য বা সৌখীনতা দেখে তাদের বুদ্ধিবৃত্তির বিচার করতে পারেন না। বুদ্ধি একটা কোষজনিত দুর্ঘটনা, যেটা কোন কোন জাতির স্নায়ুতন্ত্রীকে প্রভাবিত করে থাকে। যে কোন জায়গায় এটা আঘাত করতে পারে।

: যাই হোক, আবার আমাদের গল্পেই ফিরে আসা যাক, কী বলুন?

ছয়

প্রায় ছ'মাস ধরে সে দ্বীপে বাস করল নাবিকটি।

সমুদ্র পাখি আর নারকেল তার নিত্য আহার্য বস্তুতে পরিণত হল। নারকেলের জল পান করতে করতে কখনও পুরনো স্কচ, হুইস্কির কথা যে তার মনে জাগতো না এমন নয়। মনটা তখন একটু খারাপ হয়ে যেত।

একদিন সকালে সে দারুণ অবাক হয়ে গেল। একটা নারকেল এনে আহ্‌নিরু তার হাতে দিয়ে বললো : নাও, প্রভু, একদিন আমাদের কাছে যা চেয়েছিলে তুমি—

: কী—কী জিনিস? দেখি, দেখি। সাগ্রহে নাবিক সেটাকে মুখে তুলে নিলে। কিছুটা পান করেই উল্লাসে লাফিয়ে উঠলো সে : বাঃ বাঃ।

জিনিসটা ছিল সুরা জাতীয়। কিন্তু তার পরিচিত জগতে এ জিনিসের স্বাদ ইতিপূর্বে সে কখনও গ্রহণ করেনি।...

তিন ঘণ্টা পরে নাবিক দেখলো, অনেকগুলো ভাঙা নারকেলের মালা ছাড়িয়ে পড়ে রয়েছে তার চারপাশে।

একটা খুশির হাসি তার ঠোঁটে লেগে ছিল। বিশুদ্ধ সুখ বিরাজ করছিল মনের কোণে। আহ্‌নিরু ঝুঁকে পড়ে তার ঘাড়ের কাছে চট্‌চটে শুঁয়ো ছোঁয়ালো।

নাবিকটি পাশ ফিরে আবার নিশ্চল হয়ে পড়ে রইলো।

আহ্‌নিরু তার আরব্ধ কাজে ছিল অটল।

অবশেষে নাবিকটি উঠে বসলো। কিন্তু পরক্ষণেই টলে পড়ে গেল মাটিতে।

আহ্নিরু তার দু'জন অনুচরের সাহায্যে নাবিককে আবার তুলে বসিয়ে দিল। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিরক্তিতে গরগর করতে লাগলো, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তারা উত্যক্ত করার কাজে মেতে রইলো।

: প্রভু, সময় হয়েছে। তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি। আহ্নিরু বললো।

: সময়? কীসের সময়?

: তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষার। তোমার সব ইচ্ছা আমরা পূরণ করেছি। তুমি আমাদের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, অতিকায় জীবটিকে বধ করবে।

নাবিকের ভ্রূকুঞ্চিত হল। প্রতিজ্ঞা? তার জন্যে এরা যা করছে, সেসবের প্রতিদান দিতে হবে তাহলে?

: শোনো, শোনো। নাবিক অন্তরঙ্গভাবে বলতে চাইলো : আমাকে দিয়ে এখন তোমরা ওকাজটা করিয়ে নিতে চেয়ো না। তার কাছে আমাকে তোমরা আর ঠেলে দিতে পারো—এ্যাঁ? মনে করো, আমি যদি ওকাজ আর করতে না চাই—

আহ্নিরু শান্তভাবে বললো : তুমি করবে। প্রতিজ্ঞা করেছিলে। ওঠো।

একটা সুতীক্ষ্ণ সঙ্কেত। এবং নাবিক দেখলো, নিজের পায়ে ভর দিয়ে সে কখন উঠে দাঁড়িয়েছে। দুঃস্বপ্নের একটা নিশ্ছিদ্র প্রাচীর অতঃপর তাকে যেন ঠেলতে ঠেলতে পাহাড়ের দিকে নিয়ে চললো। বিদ্রোহ করতে চাইলো সে। দু'বার বসেও পড়ল। একিউরোইডিয়া (echiuroidea) বর্তমান শ্রমিকনীতি বোঝে না। তার মনে হল, দ্বীপটিকে যত ক্ষুদ্র সে মনে করেছিল, তত নয়।

পাহাড়ের চুড়োয় উঠতেই হল তাকে।

দুঃস্বপ্নগুলো মাটির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

নাবিকের কাছে রইলো শুধু আহ্নিরু।

: আহ্নি—আমাকে ওকাজ করতেই হবে? নাবিকের চোখে জল দেখা দিল।

: হ্যাঁ, প্রভু।

নাবিক গহ্বরের দিকে তাকালো। গহ্বরটি প্রায় ষাট ফিট দীর্ঘ এবং তিরিশ ফিট প্রশস্ত।

: গহ্বরটা খুব বড়, না?

: খুউব।

: গলাটা শুকিয়ে উঠেছে। গহ্বরের মধ্যে ঢোকবার আগে একটু ভিজিয়ে নিতে পারলে ভাল হত।

: বেশ, ব্যবস্থা করছি।

আহ্নিরু একটা সঙ্কেত দিলে। কয়েক মিনিটের মধ্যে মাটি খুঁড়ে নারকেল বেরিয়ে এল। ভূগর্ভস্থ পথ দিয়ে ওই একটা মাত্র জিনিসই নাবিকের জন্যে বহন করার অনুমতি দিয়েছিল আহ্নিরু। পর পর অনেকগুলো নারকেল এল।

: আরও, আরও নারকেল আসুক, আহ্নিরু। আমার প্রয়োজন আছে।...

দু'হাতে দুটো নারকেল নিয়ে নাবিক গহ্বরের মধ্যে এগিয়ে যেতে লাগল। অতিকায় প্রাণীটার কোন চিহ্ন প্রথমে তার নজরে পড়ল না। সেই পুরনো পূতিগন্ধটাকে গ্রহণ করার জন্যে—তার ঘ্রাণশক্তি তীক্ষ্ণ সজাগ হয়ে রইল।

হ্যাঁ—ওই যে, শুঁড়ের একটা অংশ দেখা দিয়েছে!

: আয়, আরও এগিয়ে আয়। দেখি তোর শক্তি কত? চেঁচিয়ে বললো নাবিকটি।

তবুও কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না।

নাবিক পেছন ফিরে গহ্বরের প্রবেশ পথের দিকে তাকালো।

আহ্নিরু সেখান থেকে নাবিককে লক্ষ্য করছিল।

কিছুটা যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায় নাবিকটি। সে গহ্বরের তলাটা লক্ষ্য করে আবার বলে : এগিয়ে আয়। তোর জন্যে খাবার এনেছি।

পাহাড়ের গায়ে ঠুকে একটা নারকেল ভেঙে ফেললো সে। নারকেলের জলটা গহ্বরের গা বেয়ে নিচে নেমে গেল।

একটা কিছু নড়াচড়ার শব্দ পাওয়া গেল। পরক্ষণেই আবার স্তব্ধতা নেমে এল।

আহ্নিরুর মানসিক কণ্ঠস্বর তার কানে পৌঁছলো : আজ ওর ক্ষিধে নেই মনে হচ্ছে।

: ক্ষিধে না থাকলেও, তৃষ্ণা থাকা স্বাভাবিক। আরও কিছু নারকেল পাঠাও, বন্ধু।

বিশ্বস্ত দুঃস্বপ্নেরা সঙ্গে সঙ্গে তার পরামর্শ মত কাজ করল। একটার পর একটা নারকেল ওপর থেকে গড়াতে গড়াতে নেমে আসতে লাগলো তার কাছে। সেগুলোকে নাবিক ধরে আর ভেঙে ভেঙে ছেড়ে দেয়।

অতিকায় প্রাণীটার একটা শুঁড় ওপর দিকে উঠে আসে, থরথর করে কাঁপতে থাকে। এবং তারপরেই সহসা, একটা বাঁশির মত গর্জন করে প্রাণীটা ওপর দিকে উঠে এলো।

দৃশ্যটা প্রায় অবর্ণনীয়। একটা শুঁড়ই প্রায় একশো কুড়ি ফিট লম্বা। শূন্যে সোজা উঠে গেল। ধীরে ধীরে পাক খেল তারপর সশব্দে আছাড়ে পড়লো মাটিতে। নাবিকের মনে হল, ওটা মাটিতে না পড়ে যদি তার ঘাড়ে এসে পড়ত, তাহলে তার শরীরের হাড়ও বুঝি রক্ষা পেত না। প্রাণীটির শরীরের প্রায় সমস্ত অংশই গহ্বরের প্রবেশপথের কাছে উঠে এসেছিল। নাবিকও গহ্বরের বাইরের বেরিয়ে পড়েছে। সে লক্ষ্য করল, প্রাণীটার শরীরের প্রধান অংশ বেশ মোটা—ব্যাস হবে প্রায় আঠারো ফিটের মত। অংশটা মোচড় খাচ্ছে, হাঁপানী রোগীর বুকের মত নিদারুণভাবে ওঠানামা করছে।

নিজের কর্তব্য ভুলে গিয়ে ক্ষণকালের জন্য নাবিকটি আতঙ্কে বিহ্বল বিমূঢ় হয়ে পড়ল। সেই কুৎসিত অতিকায় প্রাণীটির দিকে চেয়ে।

: শুঁড়ের মাথার ওই শুঁয়োগুলো, প্রভু। কেটে দাও শুঁয়োগুলো।

নাবিকটি ছুরি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল শুঁড়ের উপরে। শুঁয়োগুলোকে তাড়াতাড়ি কাটতে গিয়ে সে বুঝতে পারল, ওগুলো এক

একগুচ্ছ শক্তিশালী মাংসপেশী। ওরা বলে—শুঁয়ো। ওদেরই সাহায্যে প্রাণীগুলো দ্রুতগতিতে মাটির ভেতরে গর্ত করতে সক্ষম হয়।

নাবিকের ছুরির আঘাতে একটি শুঁড়ের শুঁয়োগুলো তাদের শক্তি হারালো। কিন্তু তখনও অপর শুঁড়ের শুঁয়োগুলো কর্মক্ষম রয়েছে। নাবিক সেদিকে অগ্রসর হল এবার। কিন্তু সেই শুঁড়টা, শুঁয়োগুলোর সাহায্যে দ্রুতভঙ্গীতে পাহাড়ের গায়ে গর্ত খুঁড়তে শুরু করে দিলে। নিজের সমস্ত শরীরটাকে সঙ্কুচিত করে পাহাড়ের গহ্বরের মধ্যে টেনে নিতেও চাইল।

ঠিক এই সময়েই আহ্নিরুর শত শত অনুচর ঢেউয়ের মত এগিয়ে আসতে লাগলো পাহাড়ের গহ্বরের কাছ থেকে। এক টুকরো মিষ্টি জিনিসের গায়ে যেভাবে পিঁপড়েরা লেগে থাকে, আহ্নিরুর অনুচরেরা সেই অতিকায় প্রাণীটাকে সেভাবেই এবার আক্রমণ করল। সুযোগ বুঝে নাবিকটি এলোমেলোভাবে প্রাণীটার দেহের ওপরে ছুরিকাঘাত করে চললো।

প্রাণীটাও মরিয়া হয়ে একটা শুঁড়ের সাহায্যে জড়িয়ে নিল নাবিককে। ফলে, নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগলো তার। চোখের সামনে ধীরে ধীরে অন্ধকার নেমে এসেছিল।

পরে সে জানতে পেরেছিল, আহ্নিরু তার অনুচরদের সহায়তায় তার সংজ্ঞাহীন দেহটাকে সমুদ্রের তীরে বয়ে আনে। সমুদ্রের জলে তাকে স্নান করায়। নরম পাতার বিছানা করে তার ওপরে শুইয়ে দেয় তাকে। সেবাযত্ন করতে থাকে।...

একটা গভর্ণমেন্ট লঞ্চ সমুদ্রের খাড়ি জরীপ করার জন্য পাঠানো হয়েছিল। জরীপকারীরা সেখানে নাবিকটিকে মৃতপ্রায়, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে। তাদের কাছে ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে মনে হয়। নাবিকটি সেখানে শুয়ে ছিল, অথচ তার চারপাশে বালির ওপরে কোনরকম পায়ের ছাপ ছিল না। তাহলে নাবিকটা এল কোথা থেকে? জরীপকারীরা দ্বীপটির সর্বত্র অনুসন্ধান করে দেখেছে। কোন সূত্র খুঁজে পায়নি। মানুষের ব্যবহারোপযোগী কোন আশ্রয়স্থল তো সেখানে ছিলই না।

নাবিকটা কিছুটা সুস্থ হওয়ার পরেই প্রায় উন্মাদের মত ব্যবহার করতে শুরু করে জরীপকারীদের সঙ্গে। সে তার সেই কীটের রাজত্বে আবার ফিরে যেতে চায়। জরীপকারীরা তাকে এখানে রেখে যাওয়ার পর থেকে সে অনেকবারই আমার কাছে এসে তার কাহিনী আমাকে শুনিয়েছে। মানুষটা আর কারো কোন উপকারে লাগেনি। আমি আবার তাকে, চেষ্টা করলে সেখানে পাঠিয়ে দিতে পারতাম—সেই তার দুঃস্বপ্নের দ্বীপে। কিন্তু, সমস্যাটা বুঝতে পারছেন? সভ্য জগতের মানুষ হয়ে আমি অপর একটা মানুষকে কীটের সভ্যতার মধ্যে বাস করার পরামর্শ দিই কেমন করে?

আমি শুনলাম : গভর্ণর, নাবিকের কথা আপনি বিশ্বাস করেছেন?

গভর্ণর বললেন : জরীপকারী দলে আমিও সেদিন ছিলাম যে। আমিই প্রথম লোকটাকে সমুদ্রতটে পড়ে থাকতে দেখি। তাকে আমাদের লঞ্চে তুলে নিয়ে যখন চলে আসছিলাম। বেশ কিছুদূরে আসার পরে, খেয়াল বশেই বলতে পারেন, দূরবীনটাকে আমি চোখে লাগাই। তারপর সেই দ্বীপের দিকে লক্ষ্য করে কী দেখলাম জানেন? দ্বীপটা জীবন্ত। ফিকে সবুজ রঙের হাজার হাজার হাত আমাদের লঞ্চটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সে যেন আকুল হয়ে বলছিল : ফিরে এসো, প্রভু। তুমি ফিরে এসো।

কাহিনী শেষ করলেন বিশ্বপর্যটক।

তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি উঠে পড়লাম। সেদিন শুনে এসেছিলাম, ওই হোটেলে তিনি আরও দুটো দিন থাকবেন। কিন্তু গল্প শোনার লোভে পরদিনই সেখানে গিয়ে জানতে পারলাম—রাত্রে হোটেল ত্যাগ করে চলে গেছেন তিনি। ■

পুনর্মুদ্রণ আশ্চর্য! অগাস্ট, ১৯৬৫

বিচিত্র খবর

নাড়ী পরীক্ষা করে মৃত্যু আসন্ন বলা যায়?

চৈনিক চিকিৎসকরা বলে দিতেন। এই বিদ্যে অনুসারে গোটা দেহকে একটা বহু-তার-বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করা হত। দেহের এক একটা নাড়ী যেন বাদ্যযন্ত্রের এক একটা তার। বাদ্যযন্ত্রের তারগুলো ঠিক বাঁধা আছে কিনা, তা যেমন তারে টঙ্কার দিয়ে বুঝতে হয়, নানাভাবে নাড়ী টিপে সেইভাবে দেহ-যন্ত্রের সুস্থ বা অসুস্থ অবস্থা নির্ণীত হত। প্রায় দু'শো বিভিন্ন নাড়ীর বিবরণ আর ব্যাখ্যা চৈনিক চিকিৎসাশাস্ত্রে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে অন্তত ২৬টা নাড়ী মৃত্যু-নির্দেশক। রোগীর নাড়ী পরীক্ষা করতেই চিকিৎসকের কয়েক ঘণ্টা কেটে যেত।

●

আয়ুর্বেদ কি ব্রহ্মার রচনা?

অথর্ববেদের শারীরবৃত্ত সম্প্রসারণ করে আয়ুর্বেদ রচিত হয়েছিল। বস্তুত আয়ুর্বেদ (আয়ুর্বিদ্যা) অথর্ববেদেরই এক শাখা বিশেষ। সুশ্রুত বলেন, আয়ুর্বেদ অথর্ববেদেরই উপাঙ্গ আর সহস্র অধ্যায়ে লক্ষ শ্লোকে ব্রহ্মা তা রচনা করেছিলেন।

●

আয়ুর্বেদ কি অথর্ববেদের উপবেদ?

বৃদ্ধ বাগ্‌ভট্ট আয়ুর্বেদকে অথর্ববেদের উপবেদ বলেছেন। আবার অনেক মনীষীর মতে আয়ুর্বেদ স্বতন্ত্র বেদ। চরক আর ডহ্লণ এই শেষোক্ত মতের পক্ষপাতী। লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্বেদ, ডহ্লণের মতে, মাত্র মোট ছ'হাজার মন্ত্রে সমাপ্ত অথর্ববেদের উপাঙ্গ হতে পারে না।

এ যুগের রূপকথা

ফ্যানট্যাস্টিক

কেন এত বিস্ময়কর জনপ্রিয় ?

❖ বাংলায় একমাত্র কল্পবিজ্ঞান পত্রিকা।

❖ বাংলায় কল্পবিজ্ঞানের স্বর্ণযুগ রচনা করেছিল 'আশ্চর্য!' — ১৯৭৫ সাল থেকে একই সম্পাদনায় সেই স্বর্ণযুগকে অম্লান রেখে দিয়েছে 'ফ্যানট্যাস্টিক'।

❖ 'ফ্যানট্যাস্টিক' নামাঙ্কণ করে দিয়েছেন সত্যজিৎ রায়। হরফ দিয়ে ছবি। উড়ুক্কু মহাকাশযান। শব্দের অক্ষরকে ডিজাইন করে তোলার শিল্প— ক্যালিগ্রাফি।

❖ এই বার্ষিকীর প্রতি রচনার শেষে যে নক্ষত্র বিস্ফোরণ দেখানো হয়েছে, তা সত্যজিৎ রায়ের আঁকা একটি প্রচ্ছদের কমপিউটার গ্রাফিক্সে অনুকরণ প্রচেষ্টা, প্রচ্ছদটি উনি নিমেষে কল্পনায় এনেছিলেন 'সায়ান্স-ফিকশন সিনে ক্লাব'-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের স্যুভেনির-এর জন্যে। বড় সাইজের স্যুভেনিরের সামনের প্রচ্ছদ থেকে পেছনের প্রচ্ছদ পর্যন্ত ফেটে পড়া দশ ইঞ্চি বাই পনেরো ইঞ্চি বিস্ফোরিত নক্ষত্রের মাঝে লিখে দিয়েছিলেন **SF CINE CLUB.**

❖ রূপকথা কে না চায় ? সেকালের রূপকথা একালের কল্পবিজ্ঞান। বিজ্ঞানের যুগে গল্প রূপ পালটেছে — ফ্যানট্যাস্টিক কল্পনা নতুন বাহন গ্রহণ করেছে। তাই, আট থেকে আশি সবার উপযুক্ত এ যুগের অভিনব গল্পের ঝুলি — ফ্যানট্যাস্টিক।

❖ ফ্যানট্যাস্টিক গল্পকল্পের ফের বিপুল কদর দেখা দিয়েছে বিদেশে।

❖ এই বার্ষিকীর প্রচ্ছদ তুলে ধরেছে কমপিউটারময় পৃথিবী গোলক-কে। তারপর ? 'ফ্যানট্যাস্টিক' সেই কল্পচিত্র তুলে ধরবে আগামী সংখ্যায়।

❖ ফ্যানট্যাসি এখন বিশ্ব-বিস্ময়।

ফ্যানট্যাস্টিক

অদ্রীশ বর্ধন সম্পাদিত